SHARODIYA LIPIKA

শারদীয়া লিপিকা

SEPTEMBER 2022
আশ্বিন ১৪২৯

VOLUME 16 AUTUMN ISSUE
ষোড়শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

EDITOR
DR. JHARNA CHATERJEE

TECHNICAL ADVISOR
SUPARNA MAJUMDAR

WEB MASTER
TANIMA MAJUMDAR

COVER DESIGN
REETO GHOSH

Beach Painting By Anusha Sarkar (Age 11)

La Bonne Femme

Shila Biswas

Iles Mingan or Mingan Archipelago is a group of islands located east of Quebec in the River of St. Laurence. The river is like a sea here. Mingan Archipelago is a National Park Reserve that features colossal limestone outcroppings, naturally formed, that evoke landscapes from primeval times more than a million years ago. These enchanting stone monoliths are a timeless natural wonder that one can visit aboard a sea expedition. The following picture is a painting of one of the monoliths, the most popular and the most visited one, called **La Bonne Femme** or The Good Lady because of its shape. Unfortunately, this wonderful piece has been destroyed by a severe storm. I visited this island, Ile Quarry, about thirty-five years ago. This painting may be regarded as one of the rare ones.

La Bonne Femme 6x12 in. Acrylic on canvas

Painting By Shipra Dasgupta (Age 16)

সম্পাদিকার চিঠি

এবারে আমরা লিপিকা প্রকাশ করছি আদিত্য চক্রবর্তী চলে যাবার এক বছর পরে, দেশান্তরীর কোলে আদিত্যর স্বপ্ন চিরদিন বেঁচে থাকবে এই আশা নিয়ে।

বেশ কিছু চমৎকার লেখা, আঁকা ও আলোকচিত্রের গুচ্ছ পেয়েছি আমরা। রীত ঘোষ আবার প্রচ্ছদ সৃষ্টিতে তার সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। সুপর্ণা মজুমদার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে লিপিকার সংগঠনে। তনিমা মজুমদার তুলে ধরেছে দেশান্তরীর বিদেহী জালে। আমাদের এই সমবেত প্রচেষ্টা লিপিকার পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগবে আশা করছি।

দুর্গা পূজার ঐতিহ্য গভীর অর্থবহ। একতার অপরিসীম শক্তি মহিষাসুর-রূপী কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যকে পরাজিত করতে পারে, এই কথা আমরা প্রতি বছর দুর্গা পূজার মধ্য দিয়ে নতুন করে মনে করি। প্রার্থনা করছি যেন দুর্গা দুর্গতিনাশিনী আমাদের বৃহত্তর পরিবারকে ও আমাদের সব বন্ধুদের আরোগ্য, সৌভাগ্য ও ঐক্যবন্ধনে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার আশীর্বাদ দেন।

দেশান্তরীর সভ্যবৃন্দ তথা লিপিকার পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, চিত্রশিল্পী ও আলোকচিত্র-শিল্পী – সবাইকে আমার আন্তরিক শারদীয় শুভকামনা জানাই।

ঝর্ণা চ্যাটার্জী, সম্পাদিকা, লিপিকা

অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি থাকলে মার্জনা করবেন আশা করি।

Letter from the Editor

It has been one year since Aditya Chakravarti, the creator of Lipika passed away. We are publishing this year's Lipika with the hope that his dream will always find a cherished place in the bosom of Deshantari.

Like every year, we have been blessed with a number of excellent stories, poems, paintings, and a collage of photos. Reeto Ghosh has again impressed us with his creative Cover design. Suparna Majumdar extended a helping hand in formatting and compiling Lipika. Tanima Majumdar is placing Lipika on Deshantari's website. I sincerely thank them all.

This is the time to remind ourselves what the tradition of Durga Puja really symbolizes – the triumph of unity over the lower human propensities of lust, anger, greed, delusion, egoism and jealousy- personified as Mahishasura.

May Mother Durga bless our extended family of Deshantari and our friends with health, good fortune and the capacity to enjoy the festivities together in this ideal. My best wishes to all of you during these sacred Autumn Festival days!

Jharna Chatterjee, Editor, Lipika

Please forgive our unintentional errors.

Table of Contents / সূচীপত্র

1 Cover page design	Reeto Ghosh	
2 Beach Painting	Anusha Sarkar	1
3 La Bonne Femme	Shila Biswas	2
4 Painting	Shipra Dasgupta	3
5 Editorial	Jharna Chatterjee	4
6 Table of Contents	.....	5
7 সিঁদুর মোচন	রুমা বসু	6
8 মোহিনী	সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস	10
9 Maritime Trip	Sreejita Das	12
10 রন্ধন বিভ্রাট	মৈত্রেয়ী সাহা	14
11 ঘুড়ি	সংঘমিত্রা চক্রবর্তী	15
12 A Swan Song	Subhalaksmi BasuRay	40
13 আয়নায় মুখ দেখা	সুপর্ণা মজুমদার	41
14 তালের ফুলুরি	ইন্দ্রাণী চৌধুরী	45
15 কোচিনে অবিস্মরণীয় কয়েকটি দিন	ঝর্ণা চ্যাটার্জী	47
16 আজকের কবিতা	অমর কুমার	50
17 বাড়ি ফেরা	মধুমিতা ঘোষ	52
18 উচ্ছে	অরুণ শংকর রায়	55
19 Birthday Party	Arun Shankar Roy	56
20 Pig – The big Chef	Arun Shankar Roy	57
21 Alligator Stew	Arun Shankar Roy	58
22 Painting	Dipak Roy	59
23 ছাড়ের ছায়ায় দুনিয়া ভ্রমণ	গৌর শীল	60
24 এপার ওপার	নন্দিতা রায়	63
25 My Five Mothers	Nirmal K Sinha	65
26 Morning Song	Subhash C Biswas	75
27 Painting	Bidita Mukherjee	88
28 Painting	Shonali Sen	89
29 Snow Geese Migragration	Yogadhish Das	90
30 Back Page Cover	Om Mukherjee	..

সিঁদুর মোচন

রুমা বসু

আজ ১৯৮৩ এর ১৪ ই এপ্রিল মানে ১৩৯০ এর পহেলা বৈশাখ। এখন পয়লা বৈশাখে সবাই সাদা লাল শাড়ি পরে, আর আজ আমার থেকে সব লাল চিরতরে কেড়ে নেয়া হচ্ছে। এ জীবনে আর লালের ছোঁয়াও পরতে পারবো না। আজকে ১২ বছর পর আমার হাতের শাখা ভেঙ্গে, কপাল থেকে সিঁদুর মুছে ওঁর শেষ কাজ করা হচ্ছে। মানে আমার থেকে চিরতরে ওকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য এই বারো বছর পর ওর শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে।

১৯৭০ এর ১৪ই ডিসেম্বর, ময়মনসিংহ মেডিকেলের সদ্য পাশ করা, ইন্টার্নশিপ করছে এমন ছেলের সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেল। মনোময় দেখতে রাজপুত্র নয়, কিন্তু ওর ব্যক্তিত্বে কি যেন একটা চুম্বকের মত আকর্ষণ ছিল। আমার মত এত নাক উঁচু মেয়েও সম্ভাব্য পাত্রের ছবিটা প্রথম দেখেই ওকে ভালোবেসে ফেললাম। এটা কিন্তু কোন রঙ চড়া কথা না, আমার ভেতরের এই আমি-র কথা। আমিও তখন ময়মনসিংহ মেডিকেলে ফার্স্ট ইয়ারে মাত্র ভর্তি হয়েছি। দেখতে আমি মোটামুটি ভালোই ছিলাম, তার উপর ভালো গান গাইতাম। তাই তো বাবার কাছে পাত্রের খবর নিয়ে আসা লোকের তেমন অভাব ছিল না। বাবা ছিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক। তাই ময়মনসিংহ শহরে তাঁর একটা পরিচিতি ছিল, যেটা আমার এত তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়ার পেছনে মূল কারণ। এটাই অগ্রহায়নের শেষ বিয়ের লগ্ন, পৌষে কোন বিয়ে হবে না। তাই এই একই দিনে ময়মনসিংহ শহরে আমাদের আত্মীয়দের মধ্যেই তিনটে বিয়ের দিন পড়েছে। যার জন্য আত্মীয়রা বিয়েতে ভাগ হয়ে গেছে। বাবার একমাত্র সন্তান হিসেবে বিয়েতে ধুমধাম যতটা হওয়ার কথা তার চেয়েও বেশি হয়েছে।

এদিকে দেশের অবস্থা তখন একদম ভালো না। পশ্চিম পাকিস্তানীরা কী যেন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে খুবই উত্তপ্ত হাওয়া বইছে।

ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনামলে ১৯৭০ সনে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭০ সনের অক্টোবরে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও বন্যার কারণে ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। কিছু

কিছু ক্ষেত্রে ১৯৭১ এর জানুয়ারি পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভক্তির পর থেকেই বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবাদ দাবি করে আসছিল। তবে তৎকালীন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কুচক্রী শাসকবর্গ নানাভাবে তাদেরকে দাবিয়ে রেখেছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির সেই স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয় ঘটে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল ছিল অভূতপূর্ব। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।

আর এর জেরে সারা পূর্ব বঙ্গে তখন চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে।

তার মধ্যেই আমার বিয়ে হয়ে গেল। আমি মনোময়দের বাড়ির দ্বিতীয় বউ হিসেবে বাড়িতে প্রবেশ করলাম। যদিও বড়ো জা এবং আমার ভাসুর তখন ঢাকাতে ফুলার রোড়ের ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের আবাসনে থাকেন। তাই আমার পানের বাটা আর গল্পের বইয়ে আসক্ত শ্বাশুড়িমায়ের সাথে আমিই একা থাকি। ওনার যেহেতু মেয়ে নেই, আর বড়ো বউ বিয়ের পর থেকেই ঢাকা থাকে, তাই আমাকে পেয়ে যেন ওনার দুই নেশার সাথে নতুন খেলনা নিয়ে খেলার নেশায় মেতে গেলেন। আমি সকালে ক্লাসে যাওয়ার আগে কি শাড়ি পরবো, কি খাবো সব ওনার প্রাত্যহিক খেলার রুটিনে পড়ে গেছে। আর প্রতিদিন সকালে নানা ভাবে আমার চুল বেঁধে না দিলে ওনার শান্তি হয় না।

এদিকে মনোময়ের সাথে প্রতিদিন মেডিকেলে যাওয়ার পথে আমাকে ক্ষেপিয়ে রাখে না। আমাকে নাকি বিয়ের পর আরো বেশি সুন্দর লাগে, তাই কে কবে তুলে নিয়ে যাবে তার জন্য ও নাকি সারাদিন ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। কোনো ডাক্তার যে এত রোমান্টিক হতে পারে সেটা আমি বিয়ের আগে ভাবতেই পারিনি।

ওরা মা আর ছেলে আমার মনকে এমন অবশ করে ফেললো যে অষ্টমঙলার পর আমি আর আমাদের বাড়িতে যাওয়ার আকুতিটাই বোধ করিনি। ওর সাথেই গেছি আবার খেয়ে দেয়ে ফিরে এসেছি। মা অব্দি আমার এ অবস্থা দেখে হেসে দিয়েছে। বুঝতে পারছি বৌদি টৌদিরা থাকলে আমার কিযে হাল করতো। আমার প্রচন্ড লজ্জা করলেও ওদের তীব্র ভালোবাসার কাছে আমি একেবারে হার মেনে নিয়েছিলাম।

প্রতিটা ক্লাসের ফাঁকে মনোময়কে না দেখলে আমি পরের ক্লাসে মনই দিতে পারতাম না। পুরো ময়মনসিংহ মেডিকেল জুড়েই আমাদের দুজনকে নিয়ে সারাক্ষণ কোন না কোন রসালাপ চলতেই থাকে। আমার এ জীবনের বা পূর্ব জন্মের নিশ্চয় কোন খুব ভালো কিছু আছে, যার জন্য এমন বর, এত ভালো শ্বশুর, শাশুড়ি, সবচেয়ে বড়ো কথা এমন সুখ আর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ জীবন পেয়েছি। আমি শুধু ভগবানকে বলি যে ভগবান আমার জীবনে আর কিছু চাওয়ার নেই, শুধু ওদের ভালোবাসা যেন কখনো এক চুলও না কমে।

আমদের বিবাহিত জীবনের রসায়ন যত মধুর থেকে মধুরতর হচ্ছে, তার সাথে দেশের পরিস্থিতি পাল্লা দিয়ে ততই তিক্ত আর শংকাজনক হচ্ছে। পঁচিশে মার্চ খবর এলো শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করেছে, আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকায় গোলাগুলি আর গনহত্যা হয়েছে। আর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে নাকি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে।

এদিকে আমার ভাসুর জাদের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। ময়মনসিংহে সবাই চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে। ২৮ শে মার্চ সোমবার বেলা বারোটার দিকে আমাদের বাড়িতে ভয়ংকর ঘটনাটা যেন বজ্রপাতের মত আছড়ে পড়লো। আমার জা তার মেয়েকে নিয়ে এসে খবর দিল যে ২৫ মার্চের গনহত্যার এক শিকার আমার ভাসুরও। মা বাবার কাছে সন্তানের মৃত্যু যে কি ভয়ংকর কষ্টের ব্যপার সেটা এর আগে আমি বুঝিনি। আমার শ্বশুর শাশুড়িকে দেখে আমার জীবন যেন থমকে গেল। অপমৃত্যু, তাই পরের দিনই ভাসুরের শ্রাদ্ধ হলো। আমি আমার জীবনে তখনও কাছের কোনো মানুষের মৃত্যু বা শ্রাদ্ধ কোনটাই দেখিনি। মনে হচ্ছিল আমার শ্বশুর শাশুড়ি যেন নিজেরা ছেলেকে মেরেছেন, তাদের এমন অবস্থা।

বড়োজাকে আমার শাশুড়ি সাদা শাড়ি পরতে দিলেন না, আর নিজে সচেতনভাবে লালের ছোঁয়া থাকা শাড়িগুলো এড়িয়ে গেলেন।

এদিকে আমি বোধয় আমার ভেতরে নতুন প্রাণের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি। চৈত্র মাসের আর তিনদিন বাকি আছে, তাই ভাবলাম পয়লা বৈশাখের দিনই সবাইকে প্রণাম করে কথাটা বলব। পয়লা বৈশাখের দিন সকালে বিছানা থেকে ও আমাকে উঠতেই দিচ্ছে না। আমি কপট রাগ করাতে হঠাৎ বললো হয়তো এটাই আমাদের শেষ একসাথে থাকা। আমি এবার একেবারে রেগে গেছি, আর বলেছি আর কখনো এমন অশুভ কথা মুখেও এনো

না। তখন আমাকে এক ঝটকায় টেনে নিয়ে ওর বুকের সাথে চেপে ধরে বললো, এখন কিছু কথা বলব, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে, তুমি আমাকে না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি যে আমি আমার অংশ তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। আমি বলতে যাচ্ছিলাম রেখে যাচ্ছো মানে, ও আমার মুখে ওর হাত দিয়ে আটকিয়ে আর কোনো কথাই বলতে না দিয়ে নিজেই বলে যেতে লাগলো...

দেখো মা বাবা বা তোমাকে আমি স্বর্গ, মর্ত, পাতালের সব কিছুর চেয়েও বেশি ভালোবাসি। কিন্তু দেশের প্রতি আমার দায়টা এর চেয়েও অনেক বড়ো। আমার অনাগত সন্তানকে তো আমি পরাধীন মাটিতে রাখতে পারবো না।আর দাদার নৃশংস মৃত্যুর বদলা তো আমাকেই নিতে হবে। তাই সব কিছুর জন্য আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তোমাদের জন্য স্বাধীনতার ভোর নিয়েই আমি ফিরবো। আর যদি না ফিরি, তবে আমার সন্তানকে বলবে যে তোমার জন্য বর্বর, হানাদার, পিশাচ পাকিস্তানীদের কাছ থেকে স্বাধীন দেশ ছিনিয়ে আনতে তোমার বাবা শহীদ হয়েছে।

আমি ওই মুখের উপর ওর হাতেই ফুপিয়ে কেঁদে উঠেছি। আমি তোমাকে ছাড়া এ স্বাধীনতা চাই না। স্বার্থপরের মত বলেছি, আরো তো অনেক লোক আছে যুদ্ধে যাওয়ার। তুমি কেন যাবে? তুমি যেতে পারবে না।

ও খুব শান্ত কিন্তু দৃঢ় ভাবে বললো, এ যুদ্ধে আমায় যেতেই হবে। ওকে এমনভাবে আগে কখনও কথা বলতে শুনিনি। এর পর আমি আর কিছু বলতে সাহস পেলাম না। ওর সংকল্পের কাছে হেরে গেল আমার ভালোবাসা। বুঝলাম এখন আর কোন বাধাই দেয়া যাবে না। সেদিন প্রায় বেলা দশটা পর্যন্ত আমি ওর বুকে ওভাবে শুয়েই কাঁদতে থাকলাম। চোখের জল যেন বাধা মানছে না। ও আমাকে জীবনের সবচেয়ে অনিশ্চিত সময়ে পরম নিশ্চয়তার সাথে ধরে রেখে কাঁদতে দিল।

তারপর দুজনে উঠে মা-বাবার ঘরে গেলাম। আমি উদ্ভ্রান্তের মত ওর সাথে দাঁড়িয়ে রইলাম। আর ও, মা বাবাকে প্রণাম করে বললো, মা আমি আমার অংশ যুথিকার কাছে রেখে ওকে স্বাধীন দেশে জন্মানোর জন্য যুদ্ধে যাচ্ছি। মা কিছু বলার আগেই বাবা বললেন, এমন একটা মহৎ কাজের জন্য যাচ্ছ, তাতে আমরা কোন বাধা দেবো না। কিন্তু নিজের মনের কাছে ভালো করে জিজ্ঞেস করো, তুমি কি এটাই চাও। যুথিকা বা তোমার বংশধরের জন্য চিন্তা করো না, আমরা থাকতে ওদের কিছু হবে না। তোমার মা তো যুথিকাকে

ছেলের বউ না মেয়ের মতই পালন করবে। তারপরও নিজেকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কি হুইমজিক্যালি যাচ্ছো, নাকি এটাই তোমার এখনকার কর্তব্য বলে যাচ্ছ?ও তখন ওর সেই দৃঢ় কন্ঠে বলল, বাবা এটাই আমার ব্রত। দেশ স্বাধীন না করে আমি ফিরব না। মা বাবা ওকে আর কিছুই বলতে পারল না। পয়লা বৈশাখের দিন সন্ধ্যার পর ও আরও তিনজন ছেলের সাথে চলে গেল। ওই আমাদের মনোময়কে শেষ দেখা।

আজকে বারো বছর হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু মনোময় আর ফিরে এল না। তাই তো হিন্দু রীতি অনুযায়ী নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্য ১২ বছর সধবার বেশে থেকে আজ আমি আর স্বাধীন ওর বাবার শেষ কাজ করে আমি বিধবার বেশ ধরব। এতদিন ভেবেছি ও আসবে, একদিন ঠিক আসবে। আজকে আমার সে আশাতেও শীতল জল ঢেলে আমার সব শেষ করে দিলো। ওকে চিরতরে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। আজ থেকে আমার মৃত মনকে চিতায় ওঠার আগ পর্যন্ত বয়ে বেড়াব। তারপর চিতাতে এ নশ্বর দেহ পুড়িয়ে মনটাকে অবিনশ্বর করে অমরাবতীতে মনোময়ের সাথে মিলবো...

****

মোহিনী

সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস

তোমার প্রেমে যে পড়েছে,
রূপের আগুনে সেই পুড়েছে।
তবুও সেই ফাঁদে পা দিয়েছে তারা,
এমনই তোমার রূপ।
তোমায় দেখেছি অনেকবার, জানিনা তুমি কে।
জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকি।
আমার মন্থিত অন্তরে তুমি রাতুল-রঙীন পলাশ,
আন্দোলিত স্বপ্ন হতে উত্থিত উষ্ণ শোণিতের শ্বাস,
আলোড়িত শরীরের ঝলসিত বাসনা।
লজ্জাহীনা তুমি স্মিত হাসি। কে তুমি?

আমার নাম্ মোহিনী।
সহাস্যে বললে তুমি।

মা বলে স্নেহা, বাবার আমি শ্রীলক্ষী।
অনেক প্রেমের ডালি নিয়ে কেউ বা ডাকে প্রিয়তমা।
আর অন্যেরা?
মিষ্টিমুখে স্বপ্নালু চোখে তারা বলে মধুচন্দ্রিকা।
এবার বল আমায় তুমি ডাকবে কি নামে।

তুমি রাইকিশোরী।
সূর্য্যের প্রথম আলোয় তুমি আমার চন্দ্রমল্লিকা,
পৌষালী হাওয়ায় মৃদুচঞ্চলা।
চকিত হাসি দিয়ে আমায় কর দিকভ্রান্ত।
বিকালের সোনালী রোদে গোলাপ হয়ে দাও ধরা।
আর যখন সন্ধ্যা নামে,
রজনীগন্ধার মধুর ঝরণা হয়ে হৃদয়ে আন প্লাবন।

তুমি বৈভবী।
তোমার জন্য অনেক যুদ্ধ করেছি জয়,
তোমার মৌসুমী মোহে আমি সব করেছি পণ,
তুমি বাঁধনছেড়া বলগা হরিণ, আমার বিনিদ্র জাগরণ।

চপলা তুমি মায়াবিনী।
অফুরন্ত আশা নিয়ে ছুটি বিশ্বময়,
পাহাড় পেরিয়ে খাদ, ঘোর বিপদের মুখোমুখি।
তবুও ছুটি নেশার ঘোরে, থামতে শিখিনি।
আকাশ এখন মেঘে ঢাকা, ঝড় উঠেছে।
আমার পালে আজ উথাল পাথাল হাওয়া।
ছোট্ট আমার তরী গভীর সাগরে বেহাল।
মেঘ হতে শুনি বজ্রনিনাদ শেষের সঙ্কেতধ্বনি।
নির্বিকার তুমি, হাসির আড়ালে ললাটে তোমার
আঁকলে বিজয় তিলকখানি।

Maritimes Trip

Sreejita Das (Age 19)

This summer my family (my parents, my sister and my maternal grandma) and I decided to visit the Maritimes provinces of Canada, and go on a nine day vacation by car. We visited: Quebec, New Brunswick, Nova Scotia and Prince Edward Island.

Our trip commenced on July 23, at 7 am (but everyone woke up at 6am to get organized). We then drove 6 hours to reach Tadoussac, a remote village at the intersection of the Saguenay and Saint Lawrence rivers. While this car ride was mainly uneventful and quiet, I appreciated the mellow atmosphere to absorb the beautiful scenery around us. Right as soon as we landed in Tadoussac, we went on a boat-cruise on the two rivers. We saw a variety of animals: herds of belugas, tails and fins of whales and general monuments (lighthouse, terrain and historical buildings). After that we went to our hotel and went out to a restaurant to have seafood chowder.

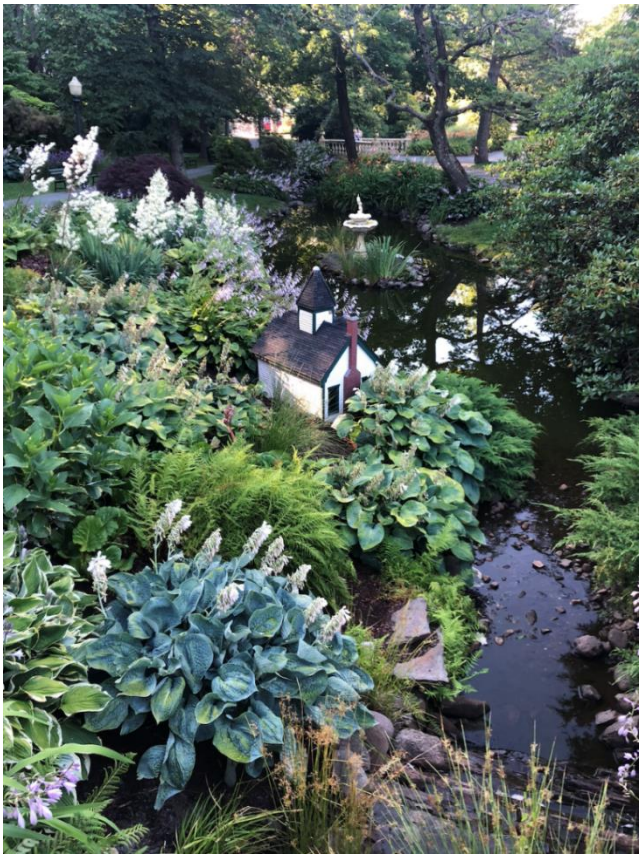

Halifax Public Gardens

The next day, we visited my dad's friend on the path to Saint John's in New Brunswick. We arrived at our hotel late at night, so we began our sightseeing on the 25th of July. We visited the Sky-walk, Quaco Bay (a beautiful beach where you can go inside an underwater cave, due to tidal waves), the Bay of Fundy Trail and Hopewell Rocks. At Quaco Bay, we also had seafood chowder.

On the 26th morning we departed for Moncton, where we saw the Magnetic Hill and Butterfly World. We then departed for Halifax, Nova Scotia! On the 26, we visited downtown Halifax, the pier and a family friend for dinner. The next morning, we visited Halifax Public Gardens, an absolutely stunning garden with beautiful flowers and ponds. We then went to Lunenburg briefly, before going to Peggy's Cove (the iconic red lighthouse in Nova Scotia). On the 28th morning, we visited Point Pleasant Park, with many historical monuments, before departing for Inverness. On the 29th, we visited Cape Breton Island (more specifically the Cabot Trail) and the various beaches and parks there. That night we arrived at Antigonish, where we stayed one night to rest before we headed to Prince Edward Island.

We arrived at Prince Edward Island at around noon on the 30th, after crossing the Confederation Bridge. We visited Thunder Cove Beach, Cavendish Beach, Basin Head Beach, Anne of Green Gables (house), Knox Dam and the Cows Ice Cream Factory all by 10 pm. It was a busy day but it was worth it. On the 31st we made our long journey (a 14-hour trip) back to Ottawa, but we took many stops in between and took turns driving to ease the load. Funny enough, during one of our stops, the car got locked with the keys still inside in some remote town in Quebec, and we had to get a kind stranger's help in finding truckers who could help us with retrieving the keys. While it wasn't funny at the moment, looking back on it I recall that time fondly. My memory of the trip is as sweet as the ice-cream from the Cow's factory and I really loved sightseeing with my family, as it served as not only a bonding experience, but a memory I will cherish forever.

রন্ধন বিভ্রাট

- **মৈত্রেয়ী সাহা**

ওগো রাঁধুনী শোন গো শোন,
মন দিয়ে আজি রান্না ক'খানি শোন –
'অতিথি এসেছে দশ বারো জন
কেহবা আপন মেসো খুড়ো হন
জানোই তোমার কত ভোলা মন
গুলিয়ে যেও না যেন।
মাছ ঝালে বাটা সরিষা মেশাবে,
চাল দিয়ে মুড়ি ঘন্ট রাঁধিবে
বেগুন পুড়িবে যেন।
ঢেঁড়স কখানি ভাতেতে ফেলিবে,
দুগ্ধ করিবে ঘন'।
বেলা বয়ে যায় গিন্নি শুধায়
'অতিথি মোদের মরিছে ক্ষুধায়
বিলম্ব কেন হেন'?

রাঁধুনী কহিল 'সবই তো তৈরী
খবর নাও নি কেন?
বেগুনে চালেতে ঘন্ট রেঁধেছি
মাছের মুড়োটি ভাতেতে ফেলেছি,
সরিষা বাটিয়া দুগ্ধে ফেলেছি
ডালটি করেছি ঘন'।
গিন্নি কহিল 'কি করি হায় রে,
অতিথি মোদের কি করে খায় রে,
যমেও ধরে না তোকে"?
দাঁত বার করে হাসে ব্রাহ্মণী
'মিথ্যে ঘ্যানর ঘ্যান করো শুনি
বার বার করে চাখিয়া দেখেছি
মন্দ হয় নি জেনো'।
আমাদের সুমি, দ্রৌপদী রন্ধনে তুমি
এমন রেসিপি ভুলেও কোরো না যেন।

ঘুড়ি

(Original story: “The Kite” by William Somerset Maugham)

অনুবাদ - **সংঘমিত্রা চক্রবর্তী**

লেখক পরিচিতিঃ-

[উইলিয়াম সমারসেট মমের জন্ম প্যারিসে। ১৮৭৪ সালে। দশ বছর বয়সে ইংলণ্ড এসে তাঁর শিক্ষা শুরু হয় ক্যান্টারবেরির কিংস্ স্কুলে। এরপর জার্মানির হেইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষান্তে তিনি সেন্ট টমাস হসপিটাল মেডিক্যাল স্কুলে পড়েন। কিন্ত চিকিৎসায় ব্যাপৃত না থেকে নিজেকে মম্ ক্রমশঃ জড়িয়ে ফেলতে থাকেন সাহিত্য সৃষ্টিতে। ১৯১৫ সালে ‘Of human Bondage’ উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজি তথা বিশ্ব সাহিত্যে তাঁর আসনটি পাকা হয়ে গেলো। ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেও বিশ্বের সেরা গল্পকারদের অন্যতম তিনি। প্রচুর গল্প লিখেছেন তিনি। তাঁর লেখা গল্পগুলি পড়লে বোঝা যায় মানব জীবন, মানব চরিত্র ও মানব মন সম্বন্ধে কি প্রগাঢ় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন মম্। বেশ কিছু নাটক ও লেখেন তিনি। এই জীবন শিল্পীর মৃত্যু ১৯৬৫ সালে।]

বেশ বুঝতে পারছি একটা বেয়াড়া ধরণের গল্প শোনাতে বসেছি আপনাদের। আসলে জানেন আমি যখন গল্পটা শুনি আমার কাছে কেমন একটা ধাঁধার মতো লেগেছিল পুরো ব্যাপারটা। কিছু একটা রহস্যের পর্দা যেন উঠি উঠি করেও মনের সামনে থেকে সরছেনা। অবশ্য গল্পটি শুনে আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল কিছু একটা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ব লুকিয়ে আছে পুরো কাহিনীতে। ফ্রয়েড পড়েও কোনো বিশেষ ফ্রয়েডিয় তত্ব দিয়ে গল্পটি বিশ্লেষণ করতে অপারগ হয়ে আমি আপনাদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা সম্পন্ন বৌদ্ধিক দরবারে পেশ করলাম গল্পটি।

প্রথমেই বলে রাখি এটি আমার নিজের চোখে দেখা বা আমার মস্তিস্কপ্রসূত কোনো গল্প নয়। এই গল্পের চরিত্রগুলিও আমার অদেখা। এক সন্ধ্যেবেলা এই গল্পটি আমি শুনি আমার বন্ধু নেড় প্রেস্টনের মুখে। আসলে ও আমাকে গল্পটা বলেছিল নেহাৎ নাচার হয়েই। গল্পের আগাপাশতলা কিছুই বুঝতে না পেরে আমার শরণাপন্ন হয় এই আশায় আমি যদি ঐ অদ্ভুত ঘটনাক্রমের ওপর আমার ফ্রয়েডিয় জ্ঞান সম্বল করে কোনো আলোকপাত করতে পারি। একদিন রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা হতে সবকটা দাঁত বের করে জানালো ও নাকি স্থানীয় ওয়ার্মউড স্ক্রাবস জেলে একটা চাকরী পেয়েছে, বেতনহীন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতে বলতে লাগলো কাজটির ধরণ ধারণ। নাকি জেলে কিছু কয়েদী আছে খুব বিষন্ন, চুপচাপ। তাদের সহমর্মী হয়ে তাদের সঙ্গে ওকে কথা বলতে হয় যাতে তাদের বেদনার ভার একটু হাল্কা হয়। আর কথা বলতে তো আমাদের নেড় প্রেস্টনের জুড়ি মেলা ভার। ওর আরেকটি গুণ আমার খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হলো অপরাধীদের প্রতি ওর দৃষ্টিভঙ্গী। নিজে সারা জীবনে একটিও অপরাধ করেনি ও। কিন্তু কি দরদের চোখে দেখে ওদের। পাদ্রীদের মতো পুলপিট থেকে নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপকরে ভাষণ প্রদান নয়। অপরাধীদেরই একজন হয়ে উঠে তাদের সুখ, দুঃখ, ব্যথাবেদনার অংশীদার হওয়া। সে যেমন মাঝেমাঝে ফুসফুসের অসুখে ভোগে, এরাও তেমনি মানসিক ভাবে

অসুস্থ। এদেরও দরকার প্রকৃত চিকিৎসক সুলভ মানবিক ব্যবহার ও আন্তরিকতা। তাই নেড যখন বললো ওর কাজে জেল কর্তৃপক্ষ আর কয়েদী উভয়পপক্ষই খুশী, মোটেই আশচর্য হলাম না।

গল্প করতে করতে নেড় আর আমি ক্যাফে রয়্যালে ঢুকলাম। কফি খেতে খেতে ডাক্তারের নিষেধ ফুৎকারে উড়িয়ে নেড় লম্বা লম্বা ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো হাভানা সিগার থেকে।

"স্ক্রাব্স জেলে এখন আমি একটা অদ্ভুত লোকের খপ্পরে পড়েছি" - চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মন্তব্য করলো নেড়। "বুঝতেই পারছিনা কিভাবে মোকাবিলা করবো ওর সঙ্গে"। "খোলসা করে বলোতো ব্যাপারটা কি"। আরাম করে চুমুক দিলাম কফির পেয়ালায়। ক্যাফে রয়্যালের কফি সত্যিই মাদকতাময়।

'ছোকরাটি তার বৌ কে ছেড়ে দিয়েছে। আদালত নির্দেশনামা জারী করেছে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রতি সপ্তাহে খোরপোষ হিসেবে ছেড়ে দেওয়া বৌএর হাতে তুলে দিতে হবে ছেলেটিকে। ছেলেটিও গোঁয়ার গোবিন্দ। এক পয়সাও ঠেকাবে না মেয়েটিকে। আমার তো ওকে বোঝাতে বোঝাতে মুখের ফেনা বেরিয়ে গেছে। কতবার বলেছি ওকে ও নিজের নাক কেটে নিজেরই মুখ নষ্ট করছে। কে শোনে কার কথা। বলে, জেলে সারা জীবন থাকবে সেওভি আচ্ছা, কিন্তু একপয়সাও ঠেকাবে না বৌকে। আমি তখন তার আবেগে আঘাত দিয়ে বললাম একদিন যাকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল তার অভুক্ত থাকা তার সহ্য হবে তো? ব্যাটা তার উত্তরে ঠা ঠা করে হেসে বলে, কেন নয়? বোঝো একবার অবস্থাখানা। একজন আপাদমস্তক সুভদ্র ছেলে, ভালো কাজ করে, স্ত্রীকে কষ্ট দিয়ে মজা পাচ্ছে, যতই সে হোক না প্রাক্তন। আমার তো যাকে বলে সসেমিরা অবস্থা'।

স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কি ছেলেটির?' আরেক রাউন্ড কফির অর্ডার দেওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে বললাম আমি। 'ও ছেলেটির ঘুড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে'। 'অ্যাঁ, কি বললে'? আমি বিষম টিষম খেয়ে একশা। 'ঠিকই শুনেছো। বৌটা ছেলেটির সাধের ঘুড়ি ছিঁড়ে খুঁড়ে দফারফা করেছে। ও বলেছে এ জীবনে মেয়েটিকে ক্ষমা করবেনা ও'। 'মাথাটা পুরো বিগড়োনো ছোকরার'। 'বরং উল্টোটা। এরকম ঠান্ডা মাথার, বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিবাদী, ভদ্র ছেলে দেখা পাওয়া ভার'।

দ্বিতীয় পাত্র কফি এসে গেল। কফির কাপে চুমুক দিয়ে গল্প বলা শুরু করলো নেড় প্রেস্টন।

ছেলেটির নাম হার্বার্ট সানবেরি। ওর মা খুবই পরিশীলিত একজন ভদ্রমহিলা। তাঁর ছেলেকে হার্বার্ট না বলে হার্ব বা বার্টি বলে ডাকা একদম পছন্দ করেন না তিনি। স্বামীকেও কখনো তিনি স্যাম বলে সম্ভাষণ করেন না। তিনি স্ত্রীর কাছে সবসময় স্যামুয়েল। শোনা যায় বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার সময় মি.সানবেরি নাকি ভাবী স্ত্রীকে বিয়েট্রিস নামে সম্ভাষিত না করে বি বলে ডাকার স্পর্দ্ধা প্রর্দশন করেছিলেন। সজোরে তার প্রতিবাদ জানান তিনি।

'বিয়েট্রিস নামেই আমি বাপ্তিস্ড হই। এতদিন সবাই আমাকে এই নামেই জেনেছে। আমিও বাকি জীবনটা তোমার কাছে আর আমার কাছের মানুষদের বিয়েট্রিস হয়েই থাকতে চাই'। মিসেস সানবেরি ছোটখাটো,রোগাপাতলা মানুষ হলেও মোটেই পলকা নন। ভালোই শক্তসমর্থ, কর্মপটিয়সী রমণী। গায়ের চামড়ার রঙ একটু ফ্যাকাশে ঠেকলেও নাক, মুখ খুব ধারালো। চোখ দুটো পুঁতির মতো চকচকে। চুল সন্দেহজনক ভাবে একটু বেশী কালো লাগলেও খুব পরিস্কার টানটান করে বাঁধা, ভিক্টোরিয়ান স্টাইলে। কিন্তু সারা জীবনে তিনি

নাকে অবধি পাউডার পাফ বোলাননি। পরণে সর্বদা কালো রঙের দামী কাপড়ের পোশাক (পাড়ারই এক মহিলার বানানো), একই সঙ্গে রুচিসম্মত ও কেজো। গলা থেকে ঝুলছে সোনার ক্রস সম্বলিত সোনার একটা সরু চেন। আর কোনো গয়না নেই সারা শরীরে।

স্যামুয়েল সানবেরিও স্ত্রীর মতোই ছোটখাটো, রোগাপাতলা মানুষ। তবে তাঁর চুল ধূসর আর মাথার উপরিভাগ বেশ পাতলা হয়ে আসছে বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। মি. সানবেরির চোখের রঙ হাল্কা নীল। গাত্রবর্ণ অনুজ্জ্বল। বহু বছর ধরে তিনি একটি লইয়ারের অফিসে করণিক হিসেবে কর্মরত। সেখানে তাঁর প্রবেশ নগণ্য পিওন রূপে। স্বীয় কর্মদক্ষতার বলে বর্তমান সম্মানজনক পদে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন। গত চব্বিশ বছর ধরে স্যামুয়েল সানবেরি একই ট্রেনে রোজ সকালে শহরে যান অফিস করতে, শুধু শনি, রবিবার আর বছরের চোদ্দটি ছুটির দিন বাদ দিয়ে। ঐ দু হপ্তা তিনি ফি বছর পরিবার নিয়ে সমুদ্রতীরে কাটান। আবার সন্ধ্যেবেলা একই ট্রেনে তাঁর শহরতলীর বাড়িতে ফেরেন। প্রতি রোববার নিয়ম করে মর্নিং কোট আর হ্যাট পরে গীর্জায় গমন। সঙ্গে বলাবাহুল্য মিসেস সানবেরি। নীতিগতভাবে সানবেরি দম্পতি মদ্যপানে বিরত থাকলেও রোববার দিনটি সেই আওতামুক্ত। সপ্তাহের ছদিন সানবেরি পরিবার স্কোন, মাখন আর একগ্লাস দুধ সহযোগে সংক্ষিপ্ত দ্বিপ্রাহরিক আহার সারলেও মিসেস সানবেরির তত্বাবধানে রোববারের বিফরোস্ট ও ইয়র্কশায়ার পুডিং সমন্বিত সান্ধ্যভোজন যে একাধারে চিত্তআকর্ষণকারী ও রসনাউদ্রেককারী তা কোনোরকম সন্দেহের উর্দ্ধে। মিসেস সানবেরি চাইতেন রোববার তাঁর স্বামী একপাত্র বিয়ার পান করুন ডিনারের সঙ্গে স্বাস্থ্যপান হিসেবে। কিন্তু কিছুতেই একা একা তিনি পান করবেন না। অগত্যা নাচার হয়ে স্ত্রীকে স্বামীকে সঙ্গদান করতেই হতো।

পরম করুণাময় ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় এই দম্পতি হার্বার্ট কে পেয়েছেন। একমাত্র সন্তান তাঁদের। চোখের মণি। ছোটবেলা থেকেই ভারী সুন্দর হার্বার্ট। যেমন চেহারায়, তেমন আচরণে।। আর হবে নাই বা কেন। মিসেস সানবেরি নিজের হাতে তাঁকে সহবৎ শিক্ষা দিয়েছেন। কি করে খাবার টেবিলে কনুই না ঠেকিয়ে বসতে হয়, কিভাবে খাওয়ার সময় ছুরি কাঁটা ধরতে হয়, কেমন সুন্দর করে আঙুলে চায়ের কাপ জড়িয়ে ঠোঁটের কাছে আনতে হয়, সমস্ত কিছু।

কালের নিয়মে বাড়তে বাড়তে অবশেষে স্কুলে যাওয়ার বয়সে পোঁছোলো হার্বার্ট। বলাবাহুল্য মাতার উদ্বেগ ভালোই বাড়িয়ে, কেননা মিসেস সানবেরি অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে রাস্তায় খেলতে না দিয়ে খুবই আগলে রেখেছেন পুত্রকে শিশুকাল থেকেই। 'খারাপ সঙ্গ খারাপ আচরণের জন্ম দেয়। নিজের ভালো নিজের কাছে'। এই ছিলো তাঁর জীবন দর্শন। ফলে বিয়ের পর থেকে একই পাড়ায়, একই বাড়িতে থেকেও কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গেই হৃদ্যতা গড়ে ওঠেনি মিসেস সানবেরির হাস্য বিনিময় ব্যতীত। তাঁর মতে পাড়ার লোকের সঙ্গে ভাব ভালোবাসা ঝুটঝামেলারই নামান্তর। তাঁর মোটেও ইচ্ছে নয় ছেলে কাউন্টি কাউন্সিল স্কুলে পড়ে আর আজেবাজে ছেলেদের সঙ্গে মেশে। কিন্তু উপায়ান্তর কিছু নেই। তাই স্কুলে প্রথমবার যাওয়ার সময় ছেলেকে পইপই করে সাবধান করলেন,'দ্যাখো হার্বার্ট, নিজেকে সামলানোর দায়িত্ব এখন থেকে তোমার। কাজেই আমার মতো চলার চেষ্টা করো। যতটা পারো কম মেশামেশি করবে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে'।

হার্বার্ট কিন্তু নিজেকে দিব্যি মানিয়ে নিল স্কুল আর স্কুলের বন্ধু দুয়েরই সঙ্গে। যেমন মেধাবী, তেমনই পরিশ্রমী ছেলে। স্কুলের রিপোর্ট অনবদ্য। ক্রমশঃ বোঝা গেল অঙ্কে খুব মাথা ওর। এবার আসরে নামলেন পিতা। 'অঙ্কে

যখন ভালো তখন ভবিষ্যতে একাউনটেন্সি নিয়েই না হয় পড়ুক। চাকরীর বাজারে একাউনট্যান্টদের খুব চাহিদা'। সগর্ব মন্তব্য মি. সানবেরির।

তাই সাব্যস্ত হলো। হার্বার্ট ও লম্বা হতে লাগলো।

'হার্বার্ট, তুমি তো দেখছি তোমার বাবার মাথায় মাথায় লম্বা হবে'। খুব খুশী মা। কিন্তু স্কুলের পাঠ সমাপনান্তে দেখা গেল বাবার চেয়ে আরো চার ইঞ্চি বেশী মাথায় বেড়েছে হার্বার্ট। শেষমেষ তার উষ্চতা ক্ষান্তি দিলো পাঁচফুট দশ ইঞ্চিতে এসে।

হার্বার্ট রূপবান। বাবা,মা দুজনেরই ভালো জিনিষ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে ও। মায়ের কাটা কাটা নাক মুখ, কালো চুল আর বাবার নীল চোখ। গায়ের রঙ একটু ফ্যাকাশেপানা ঠেকলেও দেহের ত্বক ভারী মসৃণ। স্যামুয়েল সানবেরি ও খুবই করিতকর্মা মানুষ। তাঁর ফার্মে যে একাউনট্যান্ট বছরে দুবার হিসাব পরীক্ষার্থে আসেন, তাঁরই অফিসে ঢুকিয়ে দিলেন ছেলেকে। পুত্রও একুশ বছরেই প্রতি সপ্তাহে একটা ভদ্রজনোচিত টাকা মার হাতে সঁপে দিতে সক্ষম হলো। মাতৃদেবী ও তার থেকে তিন হাফ ক্রাউন লাঞ্চের জন্য আর দশ শিলিং হাত খরচ বাবদ ছেলেকে দিতেন। বাকী টাকা জমা করে দিতেন ছেলের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্টে, ছেলের হিতার্থে। স্বামীর উপার্জিত অর্থই তাঁর কাছে যথেষ্ট ছিলো।

হার্বার্টের একুশতম জন্মদিনের দিন রাত্রিবেলায় শুতে যাওয়ার সময় মিসেস সানবেরি হর্ষান্বিত চিত্তে স্বামীকে বললেন, 'আমাদের সত্যি ভাগ্যের সীমা নেই। পরম করুণাময় ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ। হার্বার্টের চেয়ে ভালো ছেলে আর কারুর হয় কিনা আমার জানা নেই। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় মোটামুটি সুস্থ থেকেছে ও। কখনো কোনো ঝামেলাতেও ফেলেনি আমাদের। তাহলে বলো তুমি এটাই কি প্রমাণিত হলোনা সন্তানকে সঠিকভাবে বড় করে তুললে তার কৃতিত্ব বাবা মার'?

'হ্যাঁ, ছেলে এবার বিয়ে করে নিজের সংসার পাতুক। আর কিছুই চাওয়ার নেই'।' 'এখনই বিয়ে করার কি হলো'। স্বামীর আলটপকা মন্তব্যে খুবই বিরক্ত বোধ করলেন মিসেস সানবেরি। 'কেন, আমাদের বাড়ি থাকতে ওর কি কোনো অসুবিধে হচ্ছে যে সাততাড়াতাড়ি বিয়ে করে আলাদা বাড়িতে থাকতে হবে? দ্যাখো স্যামুয়েল, কোনো রকম আজেবাজে চিন্তা তুমি ছেলের মাথায় ঢোকাবে না। তাহলে কিন্তু প্রবল ঝগড়া হবে আমাদের মধ্যে। আর তুমি খুব ভালো করেই জানো কথা কাটাকাটি আমার কতটা অপছন্দ। আর একটা শুনে রাখো। হার্বার্টের বাস্তবজ্ঞান তোমার থেকে অনেক বেশী। ও খুব ভালোই জানে কখন ওর পক্ষে বিয়ের জন্য সবচাইতে ভালো সময়'।

মি সানবেরি এই বাবদে আর বাঙনিষ্পত্তি করলেন না। বিয়ের অব্যবহিত পরেই তিনি বুঝে গেছেন বিয়েট্রিসের সঙ্গে কথায় তিনি এঁটে উঠবেননা।

'যতক্ষণ না বিয়ের জন্য মন তৈরী হচ্ছে, কারুরই বিয়ে করা উচিৎ নয়। আর ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বছরের আগে সেই মন প্রস্তুত হয়না'।

হার্বার্টের জন্মদিনের উপহারগুলি সত্যিই ভারী সুন্দর হয়েছে। মি সানবেরি ছেলেকে একটা রূপোর হাতঘড়ি দিয়েছেন। অন্ধকারেও সময় দেখা যায় তাতে। আর মিসেস সানবেরি দিয়েছেন একটা বিশাল ঘুড়ি। ছেলেকে

যে এই প্রথমবার তিনি ঘুড়ি উপহার দিচ্ছেন তা কিন্তু নয়। হার্বার্ট মায়ের কাছ থেকে প্রথম ঘুড়ি পায় তার সাত বছর বয়সে। ঘটনাটি ছিলো এরকম। সানবেরিদের বাড়ির কাছেই বেশ বড় একটা পাবলিক পার্ক ছিল। ফি শনিবার বিকেলে রোদ ঝলমলে দিন হলে মিসেস সানবেরি স্বামী পুত্র সমভিব্যাহারে পার্কে হাঁটতে যেতেন, অবশ্যই পার্কে ভ্রমনরত আমজনতার সংস্পর্শরহিত হয়ে। তাঁর মতে সপ্তাহের পাঁচ পাঁচটা দিন সারাদিনমান অফিসের খুপরি ঘরে কাটানো তাঁর স্বামীর জন্য পার্কের এই খোলা হাওয়ায় সপ্তাহান্তিক ভ্রমণ খুবই জরুরী। একদিন মায়ের হাত ধরে পার্কে বেড়াতে বেড়াতে উত্তেজনায় চিৎকার করে ওঠে খুদে হার্বার্ট। 'মা, মা, দ্যাখো, আকাশে কত্ত ঘুড়ি উড়ছে!' মা তাকিয়ে দেখেন রৌদ্রকরোজ্জ্বল অপরাহ্নের আকাশের বুকে মৃদু মন্দ হাওয়ায় কত কত ছোট বড় ঘুড়ি দুলকি চালে ভেসে যাচ্ছে । 'ঠিক ভাবে কথা বলো হার্বার্ট। ওটা কত্ত নয়, কত'। 'হার্বার্ট, কোনখান থেকে ঘুড়ি ওড়ানো হয় তুমি দেখতে চাও'? পরিশীলিত মাতার হাত থেকে বালক পুত্রকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা পিতার। 'হ্যাঁ বাবা, এক্ষুনি চলো'। তর সয়না ছেলের।

পার্কের মাঝখানে বেশ একটা ঢিপি মতো উঁচু জায়গা আছে। পিতা পুত্র সেখানে পৌঁছে দেখেন অনেক বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর তাদের সঙ্গে জোটা কিছু ধেড়ে লোক ঐ ঢিপি তে উঠে সঠিক হাওয়ায় ঘুড়ি ওড়ানোর প্রচেষ্টায় দৌড়াদৌড়িতে মত্ত। কিছু ঘুড়ি উড়তে না পেরে গোত্তা খেয়ে ভূলুন্ঠিত। আবার বেশ কিছু ঘুড়ি অনুকূল হাওয়ার সহায়তায় পতপত করে আকাশে উড্ডীয়মান। তাদের মালিকেরা ওদের আরো উঁচুতে প্রেরণ করার বাসনার্থে দিগ্বিদিগ্জ্ঞানশূন্য হয়ে যতটা পারে লাটাইয়ের সূতো ছাড়াতে নিবিষ্টচিত্ত। কাজে কাজেই পিতা পুত্রের আগমন কারোরই মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ হয়ে দাঁড়ালোনা। হার্বার্ট উত্তেজনায় হাততালি সহযোগে লাফাতে লাগলো।

'মা, মা, আমার ঐ রকম একটা ঘুড়ি চাই'।

সাত বছর বয়সেই সে বেশ বুঝে গেছে কিছু চাইতে হলে বাবার চেয়ে মা ই শ্রেয়তর।

'কেন, ঘুড়ির আবার কি দরকার পড়লো?'

'আমিও ওড়াবো ওদের মতো'।

ছেলের কথায় বাবা মা ছেলের মাথার ওপর দিয়ে পরষ্পরের দিকে তাকিয়ে হাস্য বিনিময় করেন। স্নেহের হাসি। প্রশ্রয়ের হাসি। ভাবো, এত বড় হয়ে গেলো যে ঘুড়ি ওড়াবে!

'তুমি যদি লক্ষী ছেলে হয়ে থাকো সবসময়, সকালে নিজে নিজেই দাঁত মাজতে পারো আমাকে ছাড়া, তাহলে কি জানি সান্তাক্লস এই ক্রিসমাসে তোমাকে একটা ঘুড়ি দিলেও দিতে পারে'।

হাসিভরা মুখে ছেলেকে কাছে টেনে নেন মা।

সেই বছর ক্রিসমাসের সময়ে হার্বার্ট সান্টাক্লসের কাছ থেকে প্রথম ঘুড়িটা পেলো। প্রথম দিন ঘুড়ি ঠিক মতো ওড়াতে পারছিলো না হার্বার্ট। অগত্যা মি সানবেরিকেই মাঠে নামতে হলো। ঢিপিটায় উঠে হাওয়ার গতি বুঝে ছোট্ট ঘুড়িটাকে আলতো করে বাতাসের অভিমুখে ভাসিয়ে দিলেন পিতা। লাটাই হাতে পুত্র তখন অপেক্ষমান। হাওয়ায় সাঁতার কাটতে কাটতে ঘুড়ি যত ওপরে ওঠে আর তার অভিঘাতে ছোট্ট হার্বার্টের হাতের লাটাইতে যত টান পড়ে, ততই চরম উত্তেজনায় লাফাতে থাকে সে। এরপর থেকে গোটা সপ্তাহ হার্বার্ট অপেক্ষায় থাকতো

কবে শনিবারের বিকেল আসবে, আর সেদিন তাকে পার্কে নিয়ে যাওয়ার তাড়নায় বাবা মা দুজনেরই পাগল পাগল অবস্থা। তবে মাঠে পৌঁছে যখন তাঁরা পুত্রের দক্ষ হাতে ঘুড়ি ওড়ানো আর অনন্যমনা হয়ে সূতোর পর সূতো ছেড়ে তাকে মর্যাদাপূর্ণভাবে ভাসমান রাখার প্রচেষ্টায় রত দেখতেন, গর্বে বুক ভরে উঠত পিতা মাতার।

কালক্রমে ঘুড়ি ওড়ানো একটা নেশায় দাঁড়িয়ে পড়লো হার্বার্টের। ও যতই বাড়তে থাকে বয়সে আর লম্বায়, মিসেস সানবেরি ততই আরো বড়, আরো লম্বা ঘুড়ি আনতে থাকেন ছেলের জন্য। হার্বার্ট এখন ঘুড়ি ওড়ানোয় খুব দড়। হাওয়ার গতি সঠিক হিসেব করে ও এখন ঘুড়ি ওড়ায়। ঘুড়ি উড়ে যায় উঁচুতে, আরো উঁচুতে। ঘুড়ি ওড়ানোর সময় যে কায়দা কানুন ও অনায়াসে দেখায় তা রপ্ত করা অন্যের পক্ষে অসাধ্য। হার্বার্ট এখন ষোলো বছরের কিশোর। ঘুড়ি ওড়ানোতে তার পারদর্শিতা প্রায় মিথের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সে এখন বলে বলে অন্য প্রতিযোগীদের রণাঙ্গনে আহবান জানায়। তারপর নিজের ঘুড়িকে অপরূপ দক্ষতায় ভাসিয়ে দেয় অন্য ঘুড়ির দিকে। এরপর দুটো ঘুড়ির সূতো পরষ্পর জড়িয়ে যেতেই কি এক কায়দায় হ্যাঁচকা টান দিতেই শত্রুপক্ষের কাটা ঘুড়ি লাট খেতে খেতে ভূপতিত হয় ধরণীতলে। অপরপক্ষে মি সানবেরিও কম উৎসাহিত নন ঘুড়ি ওড়ানোর বাবদে। সত্যি কথা বলতে কি পুত্রের উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে পিতার মধ্যেও। বাবা যখন পরণে ডোরাকাটা ট্রাউজার আর মাথায় বোলার হ্যাট শোভিত হয়ে ঘুড়ি উড়ানরত ছেলের পিছন পিছন ধাবিত হন, সে এক ভারী মজার দৃশ্যের অবতারণা হয়। সবার পিছনে ধীর লয়ে, অভিজাত ভঙ্গিমায় হাঁটতেন মিসেস সানবেরি। হাঁটার ফাঁকে তাঁর প্রশংসাসূচক দৃষ্টি পড়তো সবার ওপরে উড্ডীয়মান পুত্রের ঘুড়ির দিকে।

শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই পুরো পরিবারের প্রথম কাজ ছিলো আকাশের দিকে চোখ রাখা। মেপে নেওয়ার চেষ্টা সেদিনের আবহাওয়া ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য উপযুক্ত কিনা। সানবেরি পরিবারের আবার পছন্দ ছিলো উল্টোপাল্টা হাওয়া সমন্বিত একটি অল্পগোছের ঝোড়ো দিন। কেননা ঐরকম দিনেই ঘুড়ি ওড়ানোর নানাবিধ কৃৎকৌশল দেখানোর সুযোগ মেলে। সপ্তাহভর সন্ধ্যেবেলা খেতে বসে শুধু ঘুড়িরই গল্প করেন সানবেরিরা। ছোট ঘুড়ির মালিকদের প্রতি একটু নাক সিঁটকোনো ভাব। আর বড় ঘুড়ির অধিপতিদের প্রতি ভালোই ঈর্ষাপরায়ণ। তাঁদের জীবনের এখন একটাই উদ্দেশ্য। মস্তবড়ো একখানা ঘুড়ির মালিকানা যা আরো অনেক অনেক উঁচু দিয়ে উড়বে। হার্বার্ট এখন আর লাটাই সূতো দিয়ে ঘুড়ি ওড়ায়না। সম্ভবপরও নয় আর তা। কেননা তার মা তার একুশ বছরের জন্মদিনে যে সাতফুটিয়া ঘুড়ি উপহারস্বরূপ দিয়েছেন তা ওড়ানোর ক্ষমতা ঐ হিলহিলে পাতলা সূতোর নেই। ঐ সাতফুটি ঘুড়ি ওড়াতে হয় পিয়ানো তারে। সেই তার ও আবার প্যাঁচানো থাকে বড় একটা ড্রামে। কিন্তু এতবড় ঘুড়িতেও মন উঠছেনা হার্বার্টের। কোনোভাবে বক্স ঘুড়ি নামে আরো বিশালাকৃতি একটা ঘুড়ির কথা তার কানে এসেছে। কোনো একজন ঘুড়িপ্রেমী আবিষ্কার করেছে সেটা। ঘুড়িটার গঠন প্রণালীও মনে ধরেছে তার। এই ডিজাইনের ঘুড়িগুলি খুব উঁচুতে ওঠে। তবে এবার আর কেনা নয়। নিজেই বানাবে। হার্বার্টের আঁকার হাত ভালোই। ও ড্রইং বুকে প্রথমে ডিজাইন করলো। তারপর তদনুযায়ী একটা ছোট মডেল করে এক বিকেলবেলা পার্কে গেলো ওড়াতে। খুব একটা উড়লোনা ঘুড়িটা। তবে প্রথমবারের এই ব্যর্থতায় মোটেও হতোদ্যম হলোনা আমাদের হার্বার্ট। যথেষ্ট একগুঁয়ে, শক্ত মনের ছেলে সে। ওকে হারানো অত সহজ নয়। নিশ্চয় কিছু ভুল হয়েছে ড্রইংএ। ঠিক শুধরে নেওয়া যাবে পরেরবার।

এর পরে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটলো। প্রতিদিন সান্ধ্যআহারের পর বেরিয়ে যেতে লাগলো হার্বার্ট। মিসেস সানবেরি যুগপৎ উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত হতে লাগলেন। মি সানবেরি স্ত্রীর ব্যাকুলতা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় রত হলেন।

ছেলের বাইশ বছর বয়স হলো। ওর বয়সী ছেলেদের কাঁহাতক আর বাড়ির মধ্যে আধবুড়োবুড়িদের সঙ্গ ভালো লাগে। সাপারের পর একটু যদি হাঁটতে যায় বা মুভি দেখতে যায় অসুবিধের কি আছে। হাটে হাঁড়ি ভাঙলো হার্বার্টই।

এক শনিবারের বিকেলে মাঠে দেদার মজা করে ঘুড়ি উড়িয়ে সন্ধ্যেবেলা খাবার টেবিলে হার্বার্ট ঘোষণা করলো, 'মা, কাল বিকেলে একটি মেয়ে চা খেতে আমাদের বাড়ি আসবে। আমি তাকে নিমন্ত্রণ করেছি। ঠিক আছে তো?' 'অ্যাঁ, কি করেছো?' মিসেস সানবেরি দমকা কাশির ফাঁকে কোনোক্রমে বললেন।

'ঠিকই শুনেছো মা'। ছেলে যারপরনাই বিরক্ত।

'মেয়েটি কে আর কি করেই বা চিনলে তাকে?' হৃত ব্যক্তিত্ব উদ্ধারে প্রয়াসী মা যথেষ্ট গম্ভীর গলায় বললেন। 'মেয়েটির নাম বিভান। বেটি বিভান। কোনো এক শনিবার সিনেমা দেখতে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ। সেদিন খুব বৃষ্টিও হচ্ছিলো। আলাপ হয় হঠাৎ। ও আমার পাশে বসেছিলো। ওর হাত থেকে ব্যাগ মাটিতে পড়ে গেলে আমি তুলে দিলাম। ও ধন্যবাদ জানালো। আমিও কথা শুরু করলাম। তারপর যা হয়'।

'তার মানে সেই পুরনো খেলা। নায়িকার হাত থেকে ব্যাগ পড়ে গেলো আর নায়ক তা কুড়িয়ে নায়কের হাতে দিলো'। মিসেস সানবেরি ভ্রুকুটিলাঞ্ছিত চোখে পুত্রের দিকে তাকালেন।

'তুমি ভুল ভাবছো মা। বেটি খুব ভালো মেয়ে। লেখাপড়াতেও ভালো'। এবার বিরক্ত হওয়ার পালা ছেলের।

'কবে এসব ঘটনা ঘটলো?'

'তিনমাস আগে'।

পুত্রের উত্তরে মাতা খুবই কুপিত।

'তিনমাস আগে দেখা হয়েছে আর আগামী কাল তুমি মেয়েটিকে চায়ে ডাকছো'? মিসেস সানবেরির ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গার মুখে।

'না, না। ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। প্রথমদিন আলাপের পর আমি ওকে সেই মঙ্গলবার আবার ছবি দেখার জন্য আসতে বললাম। প্রথমে একটু গাঁইগুঁই করলেও পরে রাজী হলো আসতে। এরপর থেকে আমরা নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে দুদিন ছবি দেখতে যাই'। হার্বার্টের চোখে মুখে একটু লজ্জার আভাস।

'মা, তুমি যদি না চাও ওকে আসতে বারণ করে দিই বরং। বলে দেবো হঠাৎ তোমার খুব মাথা ধরে গিয়েছে। আমরা না হয় কোনো রেঁস্তোরায় চলে যাবো'।

হার্বার্টের কথায় এবার আসরে নামলেন মি সানবেরি। 'না, না, আনবে না কেন মেয়েটিকে। একশোবার আনবে। তোমার মার অচেনা মানুষের সঙ্গে মিশতে প্রথমে একটু অসুবিধে হলেও পরে সব ঠিক হয়ে যায়'। এবার অটল গাম্ভীর্য ভেঙ্গে ছেলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন মা। 'করে কি মেয়েটা?' হালে পানি পেলো হার্বার্ট মায়ের কথায়। 'বেটি টাইপিস্ট। শহরে একটা মার্চেন্ট অফিসে কাজ করে। একাই থাকে। আসলে মা মারা যাওয়ার পর ওর বাবা আবার বিয়ে করেন। তাঁদের তিনটে ছেলেমেয়েও হয়। কিন্তু সৎমার সঙ্গে মোটে

বনেনা বেটির। ভদ্রমহিলা সারাক্ষণ খিটখিট করেন ওর সঙ্গে। তাই বাধ্য হয়ে ও বাড়ি ছেড়ে চলে এসে ভাড়াবাড়িতে উঠেছে'।

পরের দিন দুপুর থেকেই চা-চক্র নিয়ে মহাব্যস্ত মিসেস সানবেরি। খাবার ঘরে ব্যবস্থা না করে বসার ঘরেই আয়োজন করলেন তিনি এবং অত্যন্ত কেতাদুরস্তভাবে। সবচেয়ে দামী টিসেট যা প্রাণে ধরেও কক্ষনো মিসেস সানবেরি বের করেননা, এই উপলক্ষে বেরোলো। খুব যত্নের সঙ্গে স্কোন বানালেন। কেক বেক করলেন। পাতলা করে পাঁউরুটি কেটে তার ওপর পুরু করে মাখন লাগালেন।

'স্যামুয়েল, আমি মেয়েটাকে দেখাতে চাই যে আমরা যে সে কেউ নই'। গর্বভরে বললেন স্বামীকে।

হার্বার্ট বিকেলবেলা মিস বিভানকে আনতে গেলে মিসেস সানবেরি মি সানবেরিকে প্রধান দরজার সামনে মোতায়েন রেখে দিলেন যাতে হার্বার্ট বাবাকে ডিঙিয়ে ডাইনিং রুমে না ঢুকতে পারে। আসলে সাধারণ ভাবে ঐ ঘরটিই তাদের বসার ও খাওয়ার জন্য বরাদ্দ কিনা। হার্বার্ট মেয়েটিকে নিয়ে বসার ঘরে ঢুকে অনাবশ্যক ভাবে অতিরিক্ত সাজানো চায়ের টেবিলের দিকে একটু বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকালো।তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,

'মা, এই যে বেটি'।

'বুঝেছি, তুমি বলতে চাইছ ইনিই মিস বিভান'। এক চিলতে হাসি ফুটতেনা ফুটতেই মিলিয়ে গেলো মিসেস সানবেরির ঠোঁট থেকে।

হ্যাঁ, সেটা ঠিক। কিন্তু আমাকে বেটি বলে ডাকলে আমি বেশী খুশী হবো'। মিষ্টি করে হাসলো বেটি।

'ঐ নামে ডাকতে হলে আরেকটু পরিচয়ের আবশ্যক। নয়কি?' মিসেস সানবেরির হাসিতে আভিজাত্যের স্পর্শ।

আশ্চর্যজনকভাবে বা হয়তো মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, বেটি বিভানকে অবিকল তরুনী মিসেস সানবেরির মতো দেখতে। একরকম টিকোলো নাক, ঝরঝরে মুখ, পুঁতির মতো চকচকে চোখ। তফাৎ শুধু প্রসাধনে। মিসেস সানবেরি যেমন সাজগোজের ধার দিয়েও যাননা সেখানে মিস বিভানের ওষ্ঠাধর লাল লিপস্টিকে রঞ্জিত, কপোল গোলাপী রুজে রাঙা, ঘাড় অবধি ছড়ানো গুচ্ছ গুচ্ছ চিরস্থায়ী ভাবে কুঁকড়ে ফেলা কালো চুলের ঢাল। মিসেস সানবেরি এক লহমায় জরিপ করে নিলেন বেটি বিভানকে। তার রেওনের ছোট ঝুলের স্মার্ট পোশাক, চামড়ার রঙের হাঁটু অবধি মোজা, দামী হাইহিলড় জুতো কিছুই পছন্দ হলোনা ওঁর। সাজগোজও ওঁর মাপকাঠি অনুযায়ী যথেষ্ট চড়া। তবে তিনি পরিশীলিত রুচির মানুষ। মনের ভাব যাই হোক না মুখে তা কখনোই প্রকাশিত হবেনা। হাসি হাসি মুখে চা ঢালতে ঢালতে তিনি হার্বার্টকে বললেন মিস বিভানকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে। এবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন,

'স্যামুয়েল, মিস বিভান কে প্লিজ জিজ্ঞেস করো উনি পাঁউরুটি মাখন নেবেন না স্কোন'।

'দুটোই খাবে। ছেলেমানুষ। এখনই তো খাওয়ার সময়'। একগাল হেসে দুটো প্লেটই বেটির সামনে এগিয়ে দেন মি স্যামুয়েল। বেটি খুব অস্বাছন্দ্যে এক টুকরো পাঁউরুটি আর একটা স্কোন নিজের প্লেটে নিলো। মিসেস সানবেরি বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে আবহাওয়া নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। মেয়েটি যে তাঁর সান্নিধ্যে ভালোই অস্বস্তিতে

পড়েছে এটি অনুভব করে তিনি অদ্ভুত একটা তৃপ্তি পেলেন। এবার মিসেস সানবেরি কেক থেকে একটা বড়সড় টুকরো কেটে মিস বিভানের প্লেটে তুলে দিলেন। বেটি একটা কামড় দিয়ে প্লেটে রাখতে গেলে কেকের বাদবাকি টুকরো মাটিতে পড়ে গেলো।

প্রচন্ড অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি মেঝে থেকে টুকরোটা তুলতে গেলো বেটি।

'না, না। মাটি থেকে তোলার দরকার নেই। আমি আরেকটা টুকরো কেটে দিচ্ছি'। মিসেস সানবেরি সদয় কন্ঠে বললেন।

'কিছু হবেনা। মেঝেতো ভালোই পরিষ্কার আছে আমি অতটা খুঁৎখুঁতে নই'।

বেটির কথায় একটুকরো বাঁকা হাসি খেলে গেলো মিসেস সানবেরির ঠোঁটে।

'আমাদের মেঝে সবসময় পরিষ্কার থাকে। কিন্তু তাই বলে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা যে মাটিতে পড়ে যাওয়া খাবারের টুকরো তুলে আবার খাবো। হার্বার্ট, কেকের প্লেটটা একটু এগিয়ে দাওতো। মিস বিভানকে আর এক টুকরো দিই'। ছেলের দিকে তাকিয়ে নির্মল হাস্য করলেন মা।

'না, না, আমার আর লাগবেনা'।

'আমার তৈরী কেক পছন্দ হলোনা? ভারী অবাক কাণ্ড'।

তারপর একখণ্ড মুখে দিয়ে মন্তব্য করলেন, 'কেন, ভালোই তো লাগছে খেতে'।

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। খেতে খুবই ভালো হয়েছে। আসলে আমারই খিদে নেই'।

অবরুদ্ধ ক্রোধে লাল হয়ে উঠলো বেটির মুখ। চা-ও আর নিলো না। অবহেলাভরে সামনে ঠেলে দিলো মিসেস সানবেরির সাধের কাপ। তাই দেখে গা জ্বলে উঠলো মিসেস সানবেরির। 'খায় তো রান্নাঘরে বসে নড়বড়ে টেবিলে। দেখেছে নাকি এসব কখনো?' নিজেই নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

ইত্যবসরে চা পানান্তে একটা সিগারেট ধরায় হার্বার্ট।

'আমাকে একটা দাও হার্ব। আমি সিগারেট না খেয়ে আর পারছিইনা'। বেটি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আরকি।

অপরিসীম বিরক্তিতে ভরে উঠলো মিসেস সানবেরির মন। একে তো মেয়েদের ধুমপান করা মোটে পছন্দ করেননা। তার ওপর আবার ছেলেকে হার্ব বলে সম্বোধন!

'আমরা ওকে সবসময় হার্বার্ট বলে ডাকি'। গম্ভীর গলায় ভ্রু যুগল কুঞ্চিত করে বললেন মিসেস সানবেরি।

বেটি এতটা বোকা নয় যে মিসেস সানবেরির প্রথম থেকেই যে তাকে অস্বচ্ছন্দ করার ধান্দায় আছেন সেটা সে বুঝতে পারছেনা। এবার মিসেস সানবেরি তাঁকে ঘায়েল করার আয়ুধ নিজ হস্তে তার হাতে তুলে দিয়েছেন। সেই সুযোগ কি কোনোভাবে হাতছাড়া করা যায়?

‘আমি জানি সেটা। প্রথম আলাপের পর ও যখন জানালো ও হার্বার্ট নামেই বেশী পরিচিত যা হাসি পেয়েছিলো আমার বলার নয়। ভাবো এইটুকু একটা পুঁচকে ছেলের কি একখানা গালভারী নাম!’

হাসির চোটে প্রায় বেঁকে যায় বেটি।

শ্রাবণের ঘন মেঘ নেমে আসে মিসেস সানবেরির মুখে। ‘আমি দুঃখিত মিস বিভান। বাপ্তিস্মের সময় দেওয়া আমার ছেলের এত সুন্দর একটি নাম আপনার পছন্দ হলোনা। কি আর করা যাবে। তবে এই ধরণের হাবভাব দেখেই কে সমাজের কোন স্তর থেকে এসেছে স্পষ্ট বোঝা যায়’।

পরিবেশ ক্রমশঃই ঘোরালো হয়ে উঠছে দেখে বেটির পাশে এসে দাঁড়ায় হার্বার্ট।

‘তাতে কি হয়েছে মা? অফিসেও তো আমাকে সবাই বার্টি বলে ডাকে’।

টি পার্টি এরপর আর সেরকম জমলোনা। মিসেস সানবেরি মহিমাময় নীরবতায় ডুবে গেলেন। বেটির মুখ দেখে মনে হতে লাগলো কে যেন এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিয়েছে। মি সানবেরি আর হার্বার্ট শুধু জোড়াতালি দিয়ে কথাবার্তা চালানোর প্রয়াসে ব্রতী হলেন।

বেটি যে তাঁর আচরণে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত এটা বুঝতে পেরে কেমন একটা পংকিল আনন্দ পেলেন মিসেস সানবেরি। আরো বুঝলেন মেয়েটি এই দমবন্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু তাকে বসিয়ে রেখে আরো নিষ্ঠুর আমোদ তিনি উপভোগ করতে লাগলেন। অবশেষে হার্বার্টই উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো।

‘ঠিক আছে বেটি। এবার যাওয়া যাক। চলো, তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিই’।

‘এখনি যাবেন? ভালো লাগলো আপনি এলেন’। মিসেস সানবেরি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

‘বেশ সুন্দর মেয়েটি’। বাচ্চারা বিদায় হলে দ্বিধান্বিত স্বরে বললেন মি সানবেরি।

‘সুন্দর না ছাই। পাউডার মেখে আর পেন্ট করে সুন্দর। মুখখানা জল দিয়ে ধুলে আর পার্ম করা চুল সোজা করে দিলে দেখা যাবে কোথায় থাকে ঐ সৌন্দর্য। একদম সাধারণ একটা মেয়ে। ঐ রাস্তার ধুলোর মতো’।

মিসেস সানবেরি ভাষার শুদ্ধতা আর বজায় রাখতে পারলেননা।

ঘন্টাখানিক পর রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে হার্বার্ট বাড়ি ফিরলো।

‘মা, বেটির সঙ্গে কেন ওরকম ব্যবহার করলে? লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে’।

মাও তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। ‘যা করেছি ঠিক করেছি। তুমিই বা ঐ ধরণের মেয়েকে বাড়ি আনো কেন? কোনো ক্লাস নেই। রাস্তার ধুলো সব’। উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকেন মিসেস সানবেরি।

‘ও বলেছে ওর জীবনে কখনো এতটা অপমানিত হয়নি ও। কত কাণ্ড করে ঠাণ্ডা করতে হলো ওকে’।

মায়ের কথায় কর্ণপাত না করে বলেই চললো হার্বার্ট।

‘ওকে কিন্তু আর বাড়িতে আনবেনা। তুলকালাম হয়ে যাবে তাহলে’।

ব্যঙ্গের হাসি হাসে হার্বার্ট। ‘তোমার ভাবনা তোমার কাছেই রাখো। আমি আজকেই ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি’।

না, তুমি তা করতে পারোনা’। খাবি খান মিসেস সানবেরি।

‘হ্যাঁ, সেটাই আমি করেছি। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম। আজকে ও এতটা মুষড়ে পড়েছিলো আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল ওর জন্য। তাই করেই দিলাম প্রস্তাব। এত রেগে ছিলো বেটি প্রথমে তো রাজীই হচ্ছিলোনা। অনেক করে ওর রাগ ভাঙ্গাতে হলো’।

‘বোকা, একটা আস্ত বোকা’। রাগে গরগর করতে থাকেন মিসেস সানবেরি।

তারপর সে এক দৃশ্যের অবতারণা হলো বটে। মাতা পুত্র হাতের কাছে যা পেলেন, বাদামের খোলা ভাঙ্গার হাতুড়ি বা সাঁড়াশি, তা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন দ্বৈরথে। বেচারী মি সানবেরী মাতাপুত্রের দ্বন্দ্বযুদ্ধ থামাতে গিয়ে দুজনের কাছেই প্রবলভাবে তিরস্কৃত হলেন। অবশেষে ঠাস করে দরজা খুলে সশব্দে বেরিয়ে যায় হার্বার্ট আর রাগে ভরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন মিসেস সানবেরি।

পরের দিন ডিনার টেবিলে আগের দিনের প্রসঙ্গ কেউই উত্থাপন করলেন না। মিসেস সানবেরি মাত্রাতিরিক্ত শীতল ভদ্রতা নিয়ে খাবার এগিয়ে দিতে লাগলেন। হার্বার্ট মুখ ঝুলিয়ে নিঃশব্দে খেতে লাগলো। মি সানবেরি মাতাপুত্রের দিকে অসহায় ভাবে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। সাপারের পর যথারীতি হার্বার্ট বেরিয়ে গেলো।

শনিবার সকালে হার্বার্ট বাবা মাকে জানালো ঐদিন বিকেলে তার একটা জরুরী কাজ থাকার দরুণ সে সেদিন ঘুড়ি ওড়াতে মাঠে যেতে পারবেনা। ‘তোমাকে ছাড়াও আমরা ভালোই ঘুড়ি ওড়াতে পারবো’। মিসেস সানবেরি গম্ভীর গলায় বললেন।

সানবেরি পরিবারের দু সপ্তাহ ব্যাপী বার্ষিক সমুদ্রতীরে অতিবাহিত করার দিন এসে গেলো। তাঁরা সবসময় হার্ন বে তেই যান কারণ মিসেস সানবেরির মতে ওখানে অভিজাত শ্রেণীর সমাগমই বেশী। তাঁরা প্রতি বছর একই লজে ওঠেন। যাবার কদিন আগে এক সন্ধ্যেবেলা যতটা পারা যায় এরকম স্বাভাবিক গলায় হার্বার্ট বললো,

‘মা, একটা কথা বলার ছিলো। এবার লজে আমার জন্য আর ঘর বুক করার দরকার নেই। সামনের সপ্তাহেই বেটি আর আমি বিয়ে করছি। তারপরেই আমরা হানিমুনে সাউথএণ্ড যাচ্ছি’।

ঘরের মধ্যে শ্মশানের নীরবতা নেমে এলো।

নীরবতা প্রথম ভাঙ্গলেন মি সানবেরি।

‘ব্যাপারটা একটু বেশী তাড়াতাড়ি হচ্ছে, তাইনা, হার্বার্ট?’ দ্বিধা মাখানো কন্ঠ পিতার।

‘আসলে বেটির অফিসে ছাঁটাই চলছে আর প্রথম খেপেই ওর চাকরীটা গেছে। কাজেই ভাবলাম এখন বিয়ে করে নেওয়াটাই শ্রেয়। ওর পক্ষে তো এখন বাড়ি ভাড়া দেওয়াটা একটু মুশকিল। আমরা ডাবনি স্ট্রীটে দুকামরার একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। আর ব্যাংকের জমানো টাকা দিয়ে বাড়িটা সাজাবো’।

মিসেস সানবেরি একটিও কথা বললেননা। শুধু তাঁর মাংসহীন ফ্যাকাশে গাল বেয়ে জলের ধারা নামলো।

‘ওরকম কোরোনা মা। আমি তো বিয়েই করছি শুধু। আরতো কিছু নয়। সবাই তো একদিন না একদিন বিয়ে করে। তাইনা? বাবা তোমাকে বিয়ে না করলে আমি কি এখানে থাকতাম না তুমি আমাকে পেতে?’

ছেলের কথায় অধৈর্যভাবে চোখের জল মুছে ফেলেন মিসেস সানবেরি।

‘একটা কথা পরিষ্কার ভাবে শুনে রাখো হার্বার্ট। তোমার বাবা আমাকে বিয়ে করেননি, আমি তাঁকে বিয়ে করেছি। কেন জানো? তাঁকে শ্রদ্ধা করা যায়। তাঁর সঙ্গে আলাপের প্রথম দিন থেকেই আমি বুঝেছিলাম তিনি শুধু ভালো স্বামীই হবেন না, সত্যিকারের বাবাও হবেন। আজ অবধি এই দুটি ব্যাপারে আমার বিশ্বাস অটুট।’

‘মা, বেটির সঙ্গে মিশে দ্যাখো একবার। তোমার পছন্দ হবে ওকে। খুব সুন্দর মেয়ে ও। শুধু ওপরে নয়, ভেতরেও। ওর সঙ্গে মেলামেশা করলে বুঝতে পারবে তোমার সঙ্গে ওর কতখানি মিল। মা, মা, অন্তত একটা সুযোগ দাও বেটিকে’।

‘ও এই বাড়িতে পা রাখলে আমার মৃতদেহ ডিঙিয়ে ঢুকতে হবে ওকে’।

‘কি আজেবাজে কথা বলছো মা। যুক্তি দিয়ে পুরো ব্যাপারটা একটু ভাবো। দেখবে সব কিছু আবার আগের মতো হয়ে গেছে। আমরা আবার শনিবারের বিকেলগুলোতে মাঠে গিয়ে আগের মতো ঘুড়ি ওড়াবো। কিছুদিন একটু যে সমস্যা হবেনা তা অবশ্য নয়। বেটি আবার ঘুড়ি ওড়ানোর মর্ম বোঝেনা। পরে অবশ্য নিশ্চয় বুঝবে। যাইহোক, বিয়ের পরপর আমিই না হয় মাঠে এসে তোমাদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াবো। সেটি অনেক যুক্তিগ্রাহ্য হবে’।

ছেলের কথা মা একেবারে নস্যাৎ করে দিলেন। ‘সে তুমি যা ভাবার ভাবো। আমি আবার বলছি ঐ মেয়েকে বিয়ে করলে তুমি আমার ঘুড়ি ওড়ানো তো দূরের কথা, ছুঁতে শুদ্ধ পারবেনা। আমি তোমার জন্মদিনে ওগুলো তোমাকে দিয়েছি মানে তো আমার সত্ব পুরোপুরি ত্যাগ করে দিইনি। আমি সংসার খরচের টাকা বাঁচিয়ে ঘুড়িগুলো কিনেছি। তাই ওরা আমার’। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল মিসেস সানবেরির।

‘ঠিক আছে। তুমি তোমার মতো চলো। আমি আমার মতো। বেটি ঠিকই বলে ঘুড়ি ওড়ানো বাচ্চাদের খেলা। সত্যি এই বয়সে ঘুড়ি ওড়ানো আমার পক্ষে খুবই লজ্জাজনক আচরণ’।

রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় হার্বার্ট।

এর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বিয়ে করে হার্বার্ট। মি সানবেরির সঙ্গে কিন্তু হার্বার্টের প্রায় প্রত্যেকদিন সকালে অফিস যাওয়ার সময় রেলওয়ে স্টেশনে দেখা হয়। তাঁরা একই ট্রেনে এবং একই কামরায় মহানন্দে নানাবিধ গল্প করতে করতে যে যার জায়গায় যান।

একদিন সকালে অফিস যাত্রার সময় কথা বলতে বলতে হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে মি সানবেরি মন্তব্য করেন, ’এরকম আবহাওয়ায় খুব ভালো ঘুড়ি ওড়ে’।

ছেলে লুফে নেয় কথাটা। ‘বাবা, মা আর তুমি এখনো ঘুড়ি ওড়াও?’

‘ওড়াবো না? ঘুড়ি ওড়ানো তো আমাদের কাছে শুধুমাত্র নেশা নয়, আবেগও বটে। আর তোমার মা যে এত ভালো ঘুড়ি ওড়ান আমার ধারণার বাইরে ছিলো। স্কার্টটা একটু তুলে একদৌড়ে উঠে যান টিপিটায়। আর সেকি দৌড়! আমিও বোধহয় ওঁর সঙ্গে দৌড়ে হেরে যাব’।

বাবার কথা শুনে হেসে আকুল হয় ছেলে।

‘হার্বার্ট, তুমি আর ঘুড়ি কেনোনা, না? ঘুড়ি তোমার প্রাণ ছিলো!’

পিতার কথায় একটু মুষড়ে পড়ে পুত্র।

‘কি বলি বলোতো বাবা? মেয়েরা যে এত অবুঝ হয়! বেটি কিছুতেই আমাকে ঘুড়ি ওড়াতে দেবেনা। বলে ছেলেমানুষি। আর বড় ঘুড়িগুলোর এত দাম। আসলে বাড়ি সাজানোর সময় বেটি বললো সবচেয়ে ভালো ফার্নিচারগুলো কিনতে। নাকি আখেরে ওগুলোই সস্তা হবে। একবারে তো কিনতে পারিনি। অনেক দাম।তাই মাসিক কিস্তিতে কেনা। মাসে মাসে টাকা গুণতে হয় ভালোই। তারপর বাড়িভাড়া আছে’।

ছেলের কথায় বুকটা ব্যথায় ভরে ওঠে পিতার।

‘বেটি কোনো কাজের চেষ্টা করছেনা?’

‘ও বলে ও নাকি ঠিকই করেছিলো বিয়ের পর আর গাধার খাটুনী নয়। তাছাড়া ওর মতে ও বাইরে চাকরী করতে গেলে কেইবা ঘর সাফ করবে আর রান্নাই বা কে করবে’।

মি সানবেরি হতাশায় ঘাড় দোলান।

এইভাবে কেটে গেলো মাস ছয়েক। এক শনিবারের বিকেলে সানবেরি দম্পতি যথারীতি মাঠে আছেন, এমন সময়ে মিসেস সানবেরি উদাস কন্ঠে স্বামীকে বললেন, ‘স্যামুয়েল, আমি যা দেখছি তুমিও কি সেটাই দেখছো?’

‘কি আবার দেখলে তুমি?’

‘হার্বার্ট এসেছে। আমি অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি। পাছে তুমি দুঃখ পাও তাই এতক্ষণ কিছু বলিনি। ওর সঙ্গে আবার কথা বলতে যেওনা। এমন ভাব করো যেন ওকে দেখতেই পাওনি’।

স্ত্রীর কথায় ঘাড় ঘুরিয়ে স্যামুয়েল ছেলেকে দেখতে পেলেন। হার্বার্ট একদল অলস দর্শকের ভীড়ে জুটে ঘুড়ি ওড়ানো দেখছে। মা বাবার সঙ্গে কথা বলার কোনো চেষ্টা না করলেও মিসেস সানবেরি ভালোই বুঝতে পারলেন ছেলে অনন্যমনা হয়ে ঐ বিশাল ঘুড়িটির ওড়াই পর্যবেক্ষণ করছে যেটি এতকাল সে উড়িয়ে এসেছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামতে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হতে লাগলো। সানবেরিরা বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্যামুয়েল দেখলেন চাপা জয়ের আনন্দে তা ঝলমল করছে। ‘সামনের শনিবার মনে হয়না আর আসবে’।

স্বামীর কথায় প্রবল আপত্তিব্যঞ্জক ঘাড় নাড়েন বিয়েট্রিস। ‘স্যামুয়েল, বেটিং যদি অন্যায় কাজ না হতো তাহলে আমি হার্বার্ট আসবেই ঐ দিন তা নিয়ে ছ পেন্সের বাজি ফেলতাম তোমার সঙ্গে। আমি জানতাম মাঠে না এসে ও থাকতেই পারবেনা’।

মিসেস সানবেরির কথাই সঠিক প্রমাণিত হলো। পরের শনিবার এবং তার পরের প্রত্যেক শনিবার আবহাওয়া ভালো থাকলে মিউনিসিপ্যালিটির মাঠে অবধারিত ভাবে যে হার্বার্টের পদার্পণ ঘটবে সেটা দস্তুর হয়ে গেলো। অবশ্য জনকজননী ও পুত্রের মধ্যে বাক্যালাপসদৃশ কোনো ঘটনার অবতারণা হতনা। বাবা মার ঘুড়ি ওড়ানো দেখে বাবা মা বিদায় নিলে সেও মাঠ থেকে আস্তে আস্তে চলে যেতো। এইভাবে কাটলো সপ্তাহকয়েক। তারপরের এক শনিবার মাঠে গিয়ে দেখে তার জন্য এক বিশাল চমক অপেক্ষা করছে। তার পিতামাতা আগের বিশালাকৃতি ঘুড়িটির বদলে একটা বক্স ঘুড়ি নিয়ে এসেছেন, অবশ্য ছোট মডেলের, যেরকম ডিজাইন সে বিয়ের আগে করেছিলো। মাঠের তাবৎ অত্যুৎসাহী ঘুড়িপ্রেমীর দল বক্স ঘুড়ি সমেত সানবেরিদের ঘিরে হৈ হৈ করছে। মিসেস সানবেরিও তাঁর আভিজাত্যের উচ্চ আসন ত্যাগ করে আমজনতার মাঝে নেমে তাঁদের চারদিকে সমবেত জনগণকে হাতপা নেড়ে কলকল করে কিসব বলছেন। দুপক্ষের উত্তেজনাই চরমে। কোমরে হাত দিয়ে গভীর অভিনিবেশ সহকারে পুরো ব্যাপারটা নজরে রাখতে লাগলো হার্বার্ট। স্যামুয়েল প্রথমে একছুটে ঢিপির ওপর উঠে ঘুড়িটা ওড়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ জনিত দক্ষতার অভাবে ঘুড়িটি একটি গোত্তা খেয়ে ভূলুন্ঠিত হতে বাধ্য হলো। রাগে, হতাশায় হার্বার্ট হাতের মুঠো পাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলো। ঘুড়ি না উড়ে কিছু লোকের আনন্দ উৎপাদন করে ভূপতিত হবে, এই অপমান বহন করা তার পক্ষে খুব মুশকিলের ছিলো। ভগ্নোৎসাহ না হয়ে মি সানবেরি দ্বিতীয়বার ছুট লাগালেন ঘুড়িটি ওড়ানোর জন্য এবং এবার সাফল্য তাঁর করায়ত্ত হলো। সমবেত দর্শককুলের হর্ষধ্বনির মধ্যে গর্বভরে উড়তে লাগলো সানবেরি পরিবারের সাধের বক্সঘুড়ি। খানিক পরে ঘুড়িটা নামিয়ে আবার ঢিপির ওপরে উঠে ওড়ানোর তোড়জোড় শুরু করলেন মি সানবেরি।

এই ফাঁকে ছেলের কাছে গেলেন মা।

‘একবার ঘুড়িটা ওড়াবে নাকি হার্বার্ট?’

মায়ের ডাকে চোখে জল চলে এলো ছেলের।

‘হ্যাঁ মা’।

‘আমরা তো তোমার মতো অতো ভালো ঘুড়ি ওড়াতে জানিনা। তাই ছোটমতো একটা দিয়ে চেষ্টা করছি। অবশ্য আরো বড় একটা ঘুড়ি বানানোর চেষ্টাও করছি। এখানে সবাই বলাবলি করে যদি ঠিকঠাক হাওয়া পায় এর চাইতে অনেক বড় বক্সঘুড়ি তোমার হাতে মাটি থেকে দুমাইলের ওপর দিয়ে উড়বে’।

ইত্যবসরে ঘুড়ি টুড়ি গুটিয়ে মাতাপুত্রের সঙ্গে পিতাও যোগ দিলেন।

‘স্যামুয়েল, হার্বার্ট ঘুড়িটা ওড়াতে চায় একবার’।

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে পিতা ঘুড়িখানি পুত্রের হাতে সমর্পণ করলেন। হার্বার্ট মায়ের হাতে টুপিটা দিয়ে ঘুড়ি নিয়ে ছুট লাগালো ঢিপির দিকে।দক্ষ হাতের স্পর্শে মুহূর্ত্তে অনুকূল হাওয়ার দাক্ষিণ্যে অনেকটা উঁচুতে উঠে গেলো বক্সঘুড়ি। মহিমাময় সৌন্দর্যে পতপত করে উড়তে লাগলো ঘুড়ি আর তাই দেখে পাখীর পালকের মতো হাল্কা হয়ে উঠলো হার্বার্টের মন। এক অপার্থিব আনন্দে ভরে উঠলো গোটা হৃদয়। সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তাও মাথায়

এলো বাবা মা যে আরো বড় বক্সঘুড়ি তৈরী করার কথা ভাবছেন সেটা কি তাঁরা ওড়াতে পারবেন? মা তখন বললেন তার ঘুড়ি নাকি দুমাইল উঁচু দিয়ে উড়বে।

সন্ধ্যে নেমে এলো। এবার উভয়পক্ষেরই বাড়ি ফেরার পালা।

'বাড়িতে আসবে নাকি একবার? অন্ততঃ এককাপ চা খেয়ে যাও। আর আমাদের নতুন ঘুড়ির ডিজাইন টাও একবার দেখে যাও। তুমিও নতুন কিছু ডিজাইন যোগ করতে পারো'।

মায়ের আহ্বানে ইতস্তত করতে লাগলো হার্বার্ট। প্রতি শনিবারই একটু রাস্তায় হাঁটতে যাচ্ছে এইকথা বেটিকে বলে ও বেরোয়। বেটি ওর ফেরার অপেক্ষায় থাকবে আবার মার ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রলোভন সম্বরণ করাও অসাধ্য।

শেষমেষ বাবা মার সঙ্গই নিল সে।

চা পানান্তে বক্সঘুড়ির ডিজাইন দেখতে বসলো হার্বার্ট। ঘুড়িটা প্রকাণ্ড বড়। নানারকমের কলকব্জা চারপাশে লাগানো। আর দামী তো বটেই। এরকমটি ও আগে কখনো দেখেনি। সেইসঙ্গে একটা সন্দেহও মনের কোণে দানা বাঁধতে লাগলো। বাবা মা কি সত্যিই এতবড় ঘুড়ি ওড়াতে পারবেন? একসময় বলেই ফেললো কথাটা।

'চেষ্টা তো করি'।

'যদি প্রথমবার আমি তোমাদের একটু সাহায্য করি?' মায়ের কথায় ফট্ করে বললো হার্বার্ট।

'তাহলে তো দারুণ হয়'।

মায়ের কথায় প্রায় উড়তে উড়তে বাড়ি ফেরে ছেলে।

বাড়ি ঢুকে দ্যাখে বেটি হাঁড়িমুখো হয়ে বসে আছে। হার্বার্টকে দেখে মেজাজ হারায় সে।

'কোন চুলোয় গিয়েছিলে হার্ব? সাপারের সময় তো কখন পেরিয়ে গেছে'।

'ওই বাড়ি ফেরার পথে কজন স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা। ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেলো'।

স্বামীর দিকে তীক্ষ্ণ একটা দৃষ্টিপাত করে বাঙনিষ্পত্তি না করে অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে টেবিল সাজানোয় মনোনিবেশ করে বেটি।

পরের শনিবার বিকেলে হার্বার্ট যথারীতি মাঠে গেলে মিসেস সানবেরী তার হাতে ছোট বক্সঘুড়িটা তুলে দিলেন। এও জানালেন নতুন বক্সঘুড়ির অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। তিন সপ্তাহের মধ্যেই চলে আসবে।

হার্বার্ট সবে ঘুড়িটা উড়িয়েছে আকাশে, এমন সময় মিসেস সানবেরি ছেলের কাছে এলেন।

'হার্বার্ট, এলিজাবেথ এসেছে'।

অ্যাঁ, কে বেটি?'

'হ্যাঁ, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমার ওপর নজর রাখছে'।

‘রাখুকগে যতো খুশী নজর। আমি পাত্তা দিইনা’। ঘুড়ির সূতোয় ঢিল দিতে দিতে বলে হার্বার্ট।

বাইরে সাহসের ভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট ভয় পেয়েছে ও। বাবা মার বাড়িতে আজ আর চা খেতে না গিয়ে যথাসময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করলো নিজের বাড়িতে। বেটি বাইরের ঘরে প্রতীক্ষারত। মুখমণ্ডলে ঝড়ের পূর্বাভাস। হার্বার্টকে দেখামাত্র তুমুল বেগে আছড়ে পড়লো ঝড়।

‘ও, ওরাই বুঝি তোমার স্কুলের বন্ধু? তাই ভাবি হঠাৎ বেছে বেছে শনিবারের বিকেলেই হাঁটার ধুম পড়লো কেন। এই ধেড়ে বয়সে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে মাঠে! লজ্জাও করেনা!’ তীব্র ব্যঙ্গে বেঁকে যায় সুন্দর মুখখানি।

‘ঘুড়ি ওড়াতে ভালোবাসি তাই গেছি। আবার যাবো। বারবার যাবো। সেই কোন ছোটবেলা থেকে শনিবারের বিকেলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছি আমি। কোন মহারানী এলেন! তাঁর কথায় আমার চিরকালের সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দিতে হবে!’ ঝগড়ায় মুন্সীয়ানা দেখাতে হার্বার্ট ও কসুর করলোনা।

‘জানি, জানি, সব ঐ বুড়ি শয়তানীর কীর্তিকলাপ। আমার থেকে ছেলেকে কেড়ে নেওয়ার মতলব আঁটছে। তুমি যদি সত্যিকারের পুরুষমানুষ হতে, তাহলে সেদিন আমার সঙ্গে ঐ ডাইনীটা যেরকম ইতরের মতো ব্যবহার করলো তা দেখে ঐ জঘন্য মহিলার সঙ্গে তুমি আর কথা বলতেনা’। উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকে বেটি।

‘আমার মার সম্বন্ধে ঐ ধরণের বিশ্রী ভাষা প্রয়োগ করবেনা। উনি আমার মা। আমার যখন ইচ্ছে ওঁর সঙ্গে দেখা করবো’।

দুজনের ঝগড়া সহজে মিটলোনা। বেটি চিলচিৎকার করতে লাগলো। তার সঙ্গে জুটলো হার্বার্টের হেঁড়ে গলার গর্জন। এর আগেও তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। কেননা দুজনেই জেদী আর গোঁয়ার। কিন্তু এবারের মতো এতো গম্ভীর পরিস্থিতির অবতারণা আগে কখনো হয়নি। পরের দিন রোববার কেউ কারোর সঙ্গে কথা বললোনা। মাঝসপ্তাহ নাগাদ বরফ একটু গললো। তবে ওপর ওপর শান্তির একটা বাতাবরণ থাকলেও অন্তঃসলিলা একটা অশান্তির চোরাস্রোত প্রবহমান রইলো। পরপর দু শনিবার বৃষ্টি হলো ভালোই। সেটা অবশ্য শাপে বর হলো। আপাত একটি শান্ত পরিবেশ রইলো। বৃষ্টি দেখে বেটি মনে মনে হাসতে লাগলো। আর হার্বার্ট ভেতরে ভেতরে দুঃখ পেলেও মুখে তার ছাপ ফেলতে দিলোনা। নির্লিপ্ত ভাবে বাড়িতে সময় কাটাতে লাগালো। ধীরে ধীরে তাদের ঝগড়ার স্মৃতিটা ফিকে হয়ে আসতে লাগলো। এটি অবশ্য প্রকৃতির ধর্ম যে একটি নববিবাহিত অল্পবয়সী দম্পতি, যারা একটা ছোট দুকামরার বাড়িতে একসঙ্গে বসবাস করে এবং একই বিছানায় শয়ন করে, তারা তাদের মতান্তর বা মনান্তর দুটোই ভুলতে পারে মোটামুটি সহজে। বেটি তার স্বাভিমান ভুলে হার্বার্টের সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত ভালো ব্যবহার করতে শুরু করলো। ওর হয়তো মনে হয়েছে হার্বার্ট ওর জিভের ধার যথেষ্ট পরিমাণে টের পেয়ে যাওয়ায় আর বেশী ঝামেলা পাকাবেনা। আর স্বামী হিসেবে ও যথেষ্ট ভালো। টাকা পয়সার ব্যাপারে ভালোই উদার। আর কটা দিন কাটুক এমন। হার্ব ওর হাতের মুঠোয় এলো বলে।

কিন্তু তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হতে লাগলো বলাবাহুল্য হার্বার্ট বেটির দাম্পত্যাকাশকে পুর্নবার কালোমেঘে ঘনায়মান করার সম্ভাবনাকে প্রবলতর করে।অফিস যাওয়ার সময় শুক্রবার সকালে যথারীতি পিতাপুত্রের সাক্ষাৎ রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে।

‘মনে হয় আগামীকাল ঘুড়ি ওড়ানোর পক্ষে যথার্থ আবহাওয়া হবে। আর শোনো, নতুন ঘুড়িও এসে গিয়েছে’।

‘সত্যি?’ পিতার কথায় একগাল হাসে পুত্র।

‘তোমার মা বলেছেন তুমি যদি কাল মাঠে এসে ঘুড়িটা ওড়ানোয় সাহায্য করো, খুব ভালো হয় তাহলে। খুব বড়ো তো ঘুড়িটা। তবে আমার মতে বেটি না চাইলে তোমার আসার দরকার নেই মাঠে। কারোরই, এমনকি মা বাবারও উচিৎ নয় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে মাথা গলানো। আর বেটির মাথা যে ভালোই গরম তা তো জানাই। তাই আমার মনে হয় তুমি বরং এসোনা। জানোতো, তোমারি বয়সী একটি ছেলে ইদানিং মাঠে আসছে। আমাদের নতুন বক্সঘুড়ি নিয়ে ও প্রচণ্ড উত্তেজিত। বলে কিনা একমাত্র ওই নাকি ঘুড়িটা ওড়াতে সক্ষম’।

বাবার কথায় খুবই ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে ছেলে।

‘না বাবা, কোনো অচেনা লোককে আমাদের ঘুড়িতে মোটেই হাত দিতে দেবেনা। আমি ঠিক চলে আসবো’।

‘ভালো করে চিন্তাভাবনা করে তবেই কাল মাঠে এসো হার্বার্ট। আর যদি না আসতে পারো, ঠিক আছে। আমরা বুঝে যাবো সব’।

‘আমি কাল আসবোই’। জেদ ভরে বাবাকে বলে ছেলে।

পরের দিন শনিবার হলেও একটা বিশেষ কাজে হার্বার্টকে অফিস যেতে হয়েছিলো। বিকেলবেলা শহর থেকে ফিরে মহানন্দে অফিসের পোশাক ছেড়ে স্ল্যাকস্ আর পুরনো ঢিলেঢালা কোটটা পড়ছে, এমন সময় বেটি শোবার ঘরে ঢুকলো।

‘কি করছো তুমি?

‘দেখতেই পাচ্ছো অফিসের জামা পাল্টাচ্ছি। জানো বেটি, এক্ষুনি মাঠে গিয়ে আমাদের নতুন বক্সঘুড়িটা ওড়াবো। যা মজা লাগছেনা!’

হার্বার্ট এত উত্তেজিত যে বেটির কাছে সত্যিটা গোপন করতে পারলোনা।

‘না, তুমি কিছুতেই যেতে পারবেনা’। ধকধক করে জ্বলতে লাগলো বেটির চোখ।

‘কি বোকার মতো কথা বলছো। আমি যাব, ব্যস। তোমার যদি সেটা পছন্দ না হয় আমার কিছুই করার নেই’।

‘আমি কিছুতেই তোমাকে যেতে দেবোনা’।

ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দরজা আগলে দাঁড়ায় বেটি। চোখে অস্বাভাবিক গনগনে দৃষ্টি। চোয়াল শক্ত। বেটি ছোটখাটো আর হার্বার্ট লম্বা, বলশালী পুরুষ। সে বেটির দুহাত ধরে সহজেই তাকে সরিয়ে দিলো দরজার সামনে থেকে। কিন্তু বেটিও কম যায়না। দৌড়ে এসে হার্বার্টের হাঁটুর নীচে পদাঘাত করলো।

‘এবার কি এটাই চাও যে আমি তোমার চোয়ালে সজোরে একটা ঘুষি মারি?’

স্বামীর গর্জনের কয়েকগুণ বেশী চিৎকার করে বেটি ঘোষণা করলো,'যদি আজ মাঠে যাও, চিরকালের মতো এই বাড়ির দরজা তোমার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে'।

আর সহ্য হলোনা হার্বার্টের। স্ত্রীকে তুলে, তার হাত ও পা সহযোগে সমস্ত আঘাত বরণ করে তাকে বিছানায় ছুঁড়ে ফেললো। এরপর সশব্দে দরজা খুলে পদদাপ করতে করতে নিষ্ক্রান্ত হলো বাড়ি থেকে।

সানবেরিদের ছোট বক্সঘুড়িটা যেরকম উত্তেজনা ছড়িয়েছিলো মাঠে, তার চেয়ে হাজারগুণ আলোড়ন তুলে বিশাল বক্সঘুড়ি সমেত মাঠে পদার্পণ করলেন পুত্র সমেত সানবেরি দম্পতি। তবে আজকের ঘুড়ি ওড়ানোর অভিজ্ঞতা তেমন সুখপ্রদ হলোনা। আসলে ঘুড়িটা এত বড় ছিলো যে তাকে সামলানোই ছিলো মুশকিল। সানবেরি দম্পতি ঘুড়ির পিছনে ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে গেলেন। তাঁদের এবং মাঠের তাবৎ উৎসাহী ঘুড়ি উড়নেওলাদের সম্মিলিত প্রয়াসকে নিষ্ফল করে বিশালাকৃতি ঘুড়ি ভূমিশয্যা নিলো।

তবে হার্বার্ট হাল ছাড়লোনা।

'আজ উড়লোনা ঠিক আছে। আজ সঠিক হাওয়া ছিলোনা। এর পরের দিন নিশ্চয় উড়বে'।

ঘুড়ি ওড়ানো হয়ে গেলে হার্বার্ট বাবা মার সঙ্গে বাড়ি গেলো চা খেতে। চা পান করতে করতে তারা তিনজনে মিলে পুরনো দিনের মতো গল্প করতে লাগলো। সন্ধ্যে উৎরে গেলেও হার্বার্ট ওঠার আর নাম করেনা। আসলে মনে ভয় বেটির যে মেজাজ দেখে এসেছে, বাড়ি ঢোকা মাত্র না আঁচড়ে কামড়ে দেয়। কিন্তু মাকে সাপারের জোগাড় করতে দেখে তাকে উঠতেই হলো।

বাড়ি ফিরে দ্যাখে বাইরের ঘরে বসে বেটি কাগজ পড়ছে। ওকে দেখে চোখ তুললো।

'তোমার জিনিষপত্র ব্যাগে গোছানো আছে'।

'আমার কি?' স্ত্রীর কথায় খাবি খেলো হার্বার্ট।

'আমি কি বললাম শুনতে পেয়েছো নিশ্চয়। আমি তো আগেই বলেছি আজ বিকেলে এই বাড়ির চৌকাঠ পেরোলে তোমার আর এখানে ফেরৎ আসার দরকার নেই। তখন তোমার জামাকাপড় তাড়াহুড়োতে দিতে ভুল হয়ে গিয়েছিলো। এখন শোবার ঘরে সব গোছানো আছে ব্যাগে। যাও গিয়ে নিয়ে এস'। খুব শান্ত গলায় কথাগুলো বললো বেটি। বৌএর কথায় হাড় পিত্ত জ্বলে গেলো হার্বার্টের। ওর মনে হতে লাগলো কোমরের বেল্ট খুলে আচ্ছা করে পেটায় বদমেজাজী বৌটাকে।

'ঠিক আছে আমি আমার রাস্তা বুঝে নিচ্ছি'। হার্বার্ট বললো।

বেডরুমে এসে দেখলো একটা সুটকেসে তার জামাকাপড় ভরা। আর একটা ব্রাউন পেপার ব্যাগে বাদবাকি জিনিষ ঢোকানো। একহাতে সুটকেস আর অন্যহাতে পার্সেল নিয়ে সে কোনোদিকে না তাকিয়ে বসার ঘরের মধ্য দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো।

মার বাড়ী গিয়ে বেল বাজালো। মা দরজা খুলে দিলেন।

'মা আমি বাড়ি ফিরে এসেছি'।

‘সত্যি হার্বার্ট?’ এসো, ভেতরে। তোমার ঘরে নিয়ে যাও তোমার জিনিষপত্র। দেখবে একরকম আছে তোমার ঘর। আর খাবে এসো। আমরা সবে বসেছি,’ এবার ডাইনিং রুমে বসা স্বামীকে উদ্দেশ্য করে,

‘স্যামুয়েল, হার্বার্ট বাড়ি ফিরে এসেছে। যাও, এক্ষুনি গিয়ে এক কোয়ার্ট বিয়ার নিয়ে এসো’।

সাপারের পর হার্বার্ট বাবা মাকে বেটির সঙ্গে যে ঝামেলা বিশেষ করে আজকে বেধেছে সবিস্তারে তা খুলে বললো।

সব কথা শুনে ছেলেকে সান্ত্বনা দিলেন মা।

‘ঠিক আছে হার্বার্ট, তুমি যে এই ঝামেলা থেকে বেরিয়ে এসেছো এটাই বড় কথা। ওর তোমার স্ত্রী হওয়ার কোনো যোগ্যতাই নেই। একদম সাধারণ মেয়ে ও। রাস্তার ধুলো। আর তুমি কি সুন্দর পরিবেশে বড় হয়েছো বলো’।

নিজের ঘরে অনেকদিন পরে খুব ভালো ঘুমোলো হার্বার্ট। পরেরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে নামলো। দাড়ি কামায়নি। স্নান করেনি। রাতের পোশাকেই সারা সকাল কাটিয়ে দিলো নিউজ অফ্ দ্য ওয়ার্ল্ড কাগজ পড়ে।

‘আমরা আজ সকালে চ্যাপেলে যাচ্ছি না। আজ সারাদিন আমরা কাটাবো হার্বার্টের সঙ্গে। মনটা ভালো নেই বেচারার’। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন মিসেস সানবেরি।

সেই সপ্তাহে বক্সঘুড়ির সঙ্গে সঙ্গে বেটির প্রসঙ্গও কম উত্থাপিত হলো না সানবেরি পরিবারে।

‘ও তোমাকে ফিরিয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করবে’।

‘করে দেখুক তো একবার’!

মায়ের কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে ছেলে।

‘ওকে খোরপোষ দিতে হবে’।

মি সানবেরির মন্তব্যে এবার মিসেস সানবেরির রাগের পালা।

‘কেন? কিসের জন্য? আমাদের সহজ, সরল ছেলেকে বিয়ের ফাঁদে ফেলে তারই পয়সায় সাজানো বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার তার থেকেই টাকা আদায়? মামদোবাজী নাকি?’ মিসেস সানবেরির পক্ষে ভাষার বিশুদ্ধতা রাখা দুষ্কর হয়ে পড়লো।

‘ও যদি আমাকে একা একা শান্তিতে থাকতে দেয়, আমিও আইন মাফিক ওর যা প্রাপ্য নিশ্চয় দেবো’।

শান্ত গলায় বললো হার্বার্ট।

হার্বার্টের বর্তমান জীবন খুবই আরামদায়ক খাতে বইতে লাগলো। কদিনের জন্য সে যেন কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলো। গৃহপালিত পোষ্যের মতো আবার অধিষ্ঠিত হয়েছে নিজস্ব পরিসরে। ফিরে এসে আরো যেন মায়াবী হয়ে উঠেছে তার ক্ষুদ্র ঠাঁইখানি। রোজ সকালে কাজে বেরোবার সময় মা নিজের হাতে কোট ব্রাশ করে দেন। মোজা সারিয়ে রাখেন। ওর পছন্দমতো রান্না করে রাখেন। বেটি আবার রান্না করতে মোটেই ভালোবাসেনা।

বিয়ের পর কদিন দুজনে মিলে পিকনিকের মুডে রান্না করেছিলো বটে। কিন্তু মায়ের হাতে টাটকা খাবার খাওয়ায় অভ্যস্ত হার্বার্টের পক্ষে সেই খাবার গলাদ্ধকরণ করা খুবই মুশকিলের ব্যাপার ছিল। তারপর বেটি টিনফুড আমদানী করতে শুরু করলো। শেষকালে এমন হলো টিনে বোঝাই স্যামন মাছ দেখলেই বমনেচ্ছা হতো হার্বার্টের। তাছারা মায়ের বাড়িতে হাত পা ছড়িয়ে থাকা যায়। নিজের বাড়িতে তো দুটো ছোট ছোট পায়রার খোপ। তার মধ্যে একটা আবার রান্নাঘর।

'মা, আমার জীবনের সব চাইতে ভুল কাজ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া'।

'আমি তা জানি হার্বার্ট। তুমিতো আবার ফিরে এসেছো। এটাই তো সবচেয়ে বড় পাওয়া আমাদের'। মিসেস সানবেরির পুঁতির মতো চোখ জলে ভরে আসে।

শুক্রবার হার্বার্ট সাপ্তাহিক মাইনে পেলো আর সেদিনই সন্ধ্যেবেলা সানবেরিরা সবে সাপার শেষ করেছেন, অসহিষ্ণু ভাবে ডোরবেল বেজে উঠলো।

'নিশ্চয় বেটি'। সানবেরি দম্পতি একযোগে বলে উঠলেন।

হার্বার্টের মুখ এক লহমায় ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। মিসেস সানবেরির চোখ এড়ালোনা সেটা।

'কিছু ভেবোনা হার্বার্ট। আমি দেখছি ব্যাপারটা'।

মিসেস সানবেরি দরজা খুললেন। বাইরে দাঁড়িয়ে বেটি। মিসেস সানবেরিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলো বেটি। কিন্তু সেই চেষ্টা প্রতিহত করলেন তিনি।

'আমি হার্বের সঙ্গে দেখা করতে চাই'।

'দেখা হবেনা। ও বাড়িতে নেই'।

'বাজে কথা বলবেন না। আমি নিজের চোখে দেখেছি হার্ব ওর বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলো। তারপর থেকে এক মিনিটের জন্যও বাড়ি থেকে বেরোয়নি'।

'ও, তার মানে তুমি আমাদের বাড়ির ওপর নজরদারী রাখছো?' তীব্র ব্যঙ্গে বেঁকে গেলো মিসেস সানবেরির ঠোঁট। 'কোনো লাভ হবেনা তাতে। ও তোমার সঙ্গে মোটেই দেখা করতে চায়না। বেশী গণ্ডগোল করলে আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবো'।

'আমার এই সপ্তাহের টাকাটা দিয়ে দিলেই আমি চলে যাব'।

বেটির কথা শেষ হওয়া মাত্র মিসেস সানবেরি পার্স থেকে পঁয়ত্রিশ শিলিং বের করে প্রায় বেটির মুখে ছুঁড়ে মারলেন। 'জানি জানি, হার্বার্টের সঙ্গে শুধু টাকার সম্পর্ক'।

'এই কটা টাকায় কি হবে? আমার সপ্তাহের বাড়ি ভাড়াই তো বারো শিলিং'। অধৈর্যভাবে বলে বেটি।

'এর বেশী আর এক পয়সাও পাবেনা। হার্বার্টকেও তো ওর এখানে থাকা খাওয়া বাবদ আমাদের টাকা দিতে হবে'।

‘আমাকে তো ফার্নিচারের কিস্তিও দিতে হবে’।

বেটির গলায় বিপন্নতার ছোঁয়া।

‘সময় এলে ওসব নিয়ে ভাবা যাবে। এখন তাড়াতাড়ি বলো টাকাটা কি নেবে না নেবেনা। ভেতরে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে’।

দৃশ্যতই মিসেস সানবেরির কোর্টে এখন বল। হতবুদ্ধি, পরাভূত, পর্যুদস্ত, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ অবস্থায় বেটি দাঁড়িয়ে রইলো অসুখী চিত্তে। মিসেস সানবেরি ওর হাতে টাকা কটা গুঁজে দিয়ে ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

মিসেস সানবেরি তখনো ডাইনিং রুমে অবস্থানরত স্বামী পুত্রকে সমস্ত ঘটনার ইতিবৃত্যান্ত খুলে বলার উপক্রম করতেই বিপুল বিক্রমে আবার ডোরবেল বেজে উঠলো। ক্ষনিকের বিরতি। আবার নবোদ্যমে বেজে ওঠা। বাজতেই লাগলো বেল। পুত্র সমেত সানবেরি দম্পতি স্থানুবৎ বসে রইলেন। এক সময়ে বুঝিবা হতোদ্যম হয়ে বেল বাজার শব্দ বন্ধ হয়ে গেলো। সানবেরিরা অনুমান করলেন বেটি হয়তো ব্যর্থমনোরথ হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করলো।

পরেরদিন শনিবার শুরু হলো অপূর্ব আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে। ঘুড়ি ওড়ানোর পক্ষে হাওয়ার গতি যথার্থ ও আদর্শ। প্রথম দু তিন বার ব্যর্থ হলেও চার বারের বার রাজকীয় ভাবে আকাশে উড়ল বিশাল মাপের বক্সঘুড়ি। মাঠে সমবেত ঘুড়িবিলাসী জনতা প্রবল করতালির মাধ্যমে হার্বার্টকে তারিফ জানালো। হার্বার্ট যত সূতো ছাড়ে তত অভিজাত ভঙ্গিমায় ওপরে ওঠে বৃহদাকায় বক্সঘুড়ি। এত উত্তেজনা কোনোদিন ও অনুভব করেনি। হার্বার্টের নিজেকে যেন পুরো আকাশের মালিক বলে মনে হতে লাগলো।

কয়েক সপ্তাহ নিরুপদ্রবে কাটলো। এক রোববার পিতাপুত্র মিলে একটা চিঠির মুসাবিদা করতে বসলেন। চিঠিটা বেটির কাছে যাবে এই বয়ানে যে সে যদি হার্বার্ট বা তার পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপর আর কোনো জুলুম না করে তাহলে প্রতি শনিবার সকালে ডাক মারফৎ তার কাছে পঁয়ত্রিশ শিলিং পৌঁছে যাবে। এছাড়া হার্বার্ট ফার্নিচারের মাসিক কিস্তিও মিটিয়ে দেবে। চিঠির তলায় হার্বার্টের সই থাকবে। মিসেস সানবেরি তীব্র প্রতিবাদ জানালেন চিঠির বিষয়বস্তুর। কিন্তু এই প্রথম মি সানবেরি পত্নীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করলেন। হার্বার্টও বললো চিঠির মুসাবিদা সঠিক হয়েছে।

হার্বার্ট ইত্যবসরে নতুন ঘুড়ির হাল হকিকৎ জেনে গেছে। ঘুড়িখানি নিয়ে নানা কৃৎ কৌশলেও পারঙ্গম হয়েছে সে। ঐ ঘুড়িই এখন তার ধ্যানজ্ঞান। অন্যান্য ঘুড়ি উড়নেওয়ালাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার চিন্তা এখন আর তার মনের কোনেও ঠাঁই পায়না। সব রকম প্রতিযোগিতার উর্দ্ধে অবস্থান এখন তার। ঘুড়ি ওড়ানো বাবদে নিজেই সে একজন প্রতিষ্ঠান। প্রতি শনিবার তার কাছে এখন গৌরবের দিন, মহিমা বিচ্ছুরণের দিন। ঘুড়ির সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরের ‘আমি’ও যেন প্রাত্যহিকতার গ্লানি কাটিয়ে উড়তে থাকে ঝকঝকে আকাশে। তার চারপাশে জড়ো হওয়া দর্শককুলের প্রশংসা বা ঈর্ষা কিছুই যেন তাকে আর স্পর্শ করতে পারেনা। তার কাছে একমাত্র সত্য আকাশের বুকে ভাসমান ঐ ঘুড়িখানি।

তারপর এক সন্ধ্যেবেলা পিতা সমভিব্যাহারে হার্বার্ট স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরছে, পথের মাঝে বেটি তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ালো।

‘কেমন আছো হার্ব?’

হার্বার্ট সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর না করে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো। বাধ্য হয়ে মি সানবেরি পুত্রবধূর কুশল জিজ্ঞাসা করতেই বেটি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো।

‘আমি আমার স্বামীর সঙ্গে একা কথা বলতে চাই মি সানবেরি’।

এবার আগুন ঝরা দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালো হার্বার্ট।

‘তোমার যা বলার আছে আমার বাবার সামনেই বলতে হবে’।

‘ঠিক আছে’। বেটির কন্ঠে আত্মসমর্পনের সুর। ‘হার্ব, আমি চাই তুমি বাড়ি ফিরে এস। আমি যা কিছু করেছি রাগের মাথায় করেছি। সেই সন্ধ্যেবেলা যখন ব্যাগে তোমার জামাকাপড় ঢোকাচ্ছিলাম, আমার মাথায় গনগন করে আগুন জ্বলছিলো। কোনো যুক্তিবুদ্ধিই কাজ করছিলোনা তখন। আমি যা করেছি তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য করেছি। মন থেকে করিনি হার্ব। বিশ্বাস করো। ঘুড়ি নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া সত্যিই বোকা বোকা’।

‘আমি আর ফিরে যাচ্ছিনা। তুমি তোমার বাড়ি থেকে আমায় ফিরিয়ে দিয়ে আমার উপকারই করেছো’।

বেটির দুগালে অঝোর ধারা নামলো।

‘আমি তোমাকে ভালোবাসি, হার্ব। তোমার যত ইচ্ছে তুমি ঘুড়ি ওড়াও। আমি আর কিচ্ছুটি বলবোনা। তুমি শুধু ফিরে এসো’।

‘অনেক হয়েছে। আর নয়। বিবাহিত জীবনের খুরে খুরে দণ্ডবৎ। বাকি জীবন আমি কাটাতে চাই নিজের মর্জিতে। এসো বাবা’। অপসৃয়মান পিতাপুত্রের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো বেটি। পিছু নিলোনা। পরের রোববার সকালে সপুত্র সানবেরি দম্পতি চ্যাপেলে গেলেন। ডিনারের পর হার্বার্ট চললো বাড়ির পেছনে অবস্থিত কয়লা রাখার টিনশেডে বক্সঘুড়ি পর্যবেক্ষনার্থে। ওখানে সে ঘুড়িটা রাখে। বক্সঘুড়িটা এখন তার প্রাণের থেকেও প্রিয় হয়েছে। দিনের মধ্যে অন্তত পক্ষে বার দুতিন সে টিনশেডে গিয়ে দর্শন করে আসে ঘুড়িটা। এখনও গেলো

সে এবং কয়েক মূহুর্ত্তের মধ্যে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে মুখে বেরিয়ে এলো টিনশেড থেকে। হাতে কাঠ কাটার ছোট্ট একটা কুড়ুল।

‘বাবা, মা, দ্যাখো, আমাদের বক্সঘুড়িটা টুকরো টুকরো করে এই কুড়ুলটা দিয়ে কাটা। বেটিরই কাজ এটা’। খাবার ঘরে হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকে খবর দিলো হার্বার্ট।

সানবেরি দম্পতির মুখ দিয়ে একটা আর্ত চিৎকার বেরোলো। পড়িমরি করে তাঁরা দৌড় দিলেন কোলশেডের দিকে। গিয়ে দেখলেন হার্বার্ট যা বলেছে ঠিক তাই। অতো সাধের দামী বক্সঘুড়ি রণাঙ্গনে ধরাশায়ী ক্ষত বিক্ষত যোদ্ধার মতোই ভূমিশয্যা নিয়েছে। মহা আক্রোশ ভরে কেউ একজন টুকরো টুকরো করে কেটে অন্তরের

পুঞ্জীভূত তাবৎ ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ উগরে দিয়েছে ঐ মহাকায় ঘুড়িটার ওপর। ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে কাঠের অপরূপ সুন্দর ডিজাইন করা অতিকায় বক্সঘুড়ি।

'আমরা যখন চ্যাপেলে গিয়েছিলাম শয়তানীটা নিশ্চয় ঐ সময়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে এই অপকর্মটা করেছে। ঠিক নজর রেখেছে আমরা কোন সময় বাড়ি থেকে বেরোই'। ডুকরে উঠলেন মিসেস সানবেরি।

'কিন্তু ঢুকবে কি করে? বাড়িতো তালাবন্ধ ছিলো'। মি সানবেরি বললেন।

'আমার কাছে দুটো চাবি ছিলো বাড়ির। আমি যখন এখানে চলে এলাম আর একটা খুঁজে পাইনি। ওই হাতিয়েছে তার মানে'। রাগে গরগর করতে থাকে হার্বার্ট।

'আমার তা মনে হয়না। মাঠের কিছু ছেলে আমাদের বক্সঘুড়ির দিকে খুব হিংসের চোখে তাকায়। কি জানি তারাই এই কাণ্ডটা ঘটালো নাকি'। মি সানবেরি বললেন।

'ঠিক আছে, আমি দেখছি ওকে জিজ্ঞেস করে ও ঘটনাটা ঘটিয়েছে নাকি। যদি বলে হ্যাঁ, মেরেই ফেলবো আজ ওকে'।

হার্বার্টের বাঁধনছেঁড়া রাগ দেখে এবার মিসেস সানবেরি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন।

'আর তারপর ফাঁসিকাঠে ঝুলবে তুমি! না, হার্বার্ট, না। কিছুতেই আমি তোমাকে যেতে দেবনা ঐ অসভ্য মেয়েটার কাছে। তোমার বাবা বরং যান। উনি ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তোমার বাবা জেনে আসুন পুরো ব্যাপারটা। তারপর নাহয় আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে ভাববো'।

মি সানবেরিই শেষমেষ গেলেন এবং আধঘন্টার মধ্যে বাড়িও ফিরে এলেন।

'হ্যাঁ, বেটিই কাজটা করেছে। ও সোজা আমাকে বলে দিলো। আরো বললো ঐ অপকর্মটি করে ও নাকি গর্বিত। ও যে ভাষা ব্যবহার করলো তা আর নাইবা বললাম। মোদ্দা কথা ও ঘুড়িটাকে অসম্ভব হিংসে করে। ঘুড়িটা নষ্ট করার কারণ দর্শালো যে ওর চেয়ে হার্বার্ট ওর ঘুড়িকে নাকি বেশী ভালোবাসে। তাই সে ঐরকম ভাবে ঘুড়িটাকে নষ্ট করেছে। আবার যদি সুযোগ পায়, একই কম্ম করবে সে'।

'খুব ভাগ্য ভালো ওর এই কথাগুলো আমাকে বলার সুযোগ পায়নি। আমাকে বললে ঘাড় একেবারে মুচড়ে দিতাম। যাইহোক, একটা পেনিও ও আর আমার কাছ থেকে পাবেনা। এই আমি বলে রাখলাম'।

রাগে ফোঁসফোঁস করতে থাকে হার্বার্ট।

'ও টাকা না পেলে কোর্টে গিয়ে তোমার নামে নালিশ ঠুকবে'।

'করতে দাও'।

বাবার কথায় আরো রেগে যায় ছেলে।

'হার্বার্ট, সামনের সপ্তাহে ফার্নিচারের মাসিক কিস্তির টাকা দিতে হবে তোমাকে। আমি হলে অবশ্য দিতাম না'।

ছেলেকে উস্কে দেওয়ার সুযোগ ছাড়লেননা মিসেস সানবেরি।

‘তাহলে তো ওরা সব জিনিষ নিয়ে যাবে। এতদিনের দেওয়া কিস্তির টাকা সব বৃথা যাবে’।

মি সানবেরি স্ত্রীর কথায় বেশ উদবিগ্ন।

‘তাতে কি। হার্বার্ট ভালো রোজগার করে। এই ক্ষতি ও সইতে পারবে। ঐ বদমাইশ মেয়েটা ওর ঘাড় থেকে নেমেছে আর আমরাও আমাদের ছেলেকে ফিরে পেয়েছি। এটাই কি সবচেয়ে বেশী পাওয়া নয়?’

আবেগে মিসেস সানবেরির গলা ধরে এলো।

‘পয়সা নিয়ে আমি ভাবিনা। কিস্তিওয়ালারা কিস্তির টাকা না পেয়ে যখন সব ফার্নিচার নিয়ে যাবে, হিংসুটেটার মুখ কেমন হবে আমি এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছি তা, বিশেষ করে পিয়ানোটা। খুব শখের ওটা। যা মজা লাগছেনা আমার!’

জোর করে মুখ বেঁকিয়ে হাসতে থাকে হার্বার্ট।

পরের শনিবার হার্বার্ট বেটিকে তার সাপ্তাহিক টাকা পাঠালো না। বেটি চিঠি লিখে হার্বার্টকে জানালো মাসের একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে কিস্তির টাকা জমা না দিলে ওরা জিনিষ তুলে নিয়ে যাবে। তার উত্তরে হার্বার্ট জানালো নিলে নিয়ে যাবে। ওর এখন টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। বেটি সেইদিন সন্ধ্যেবেলা হার্বার্টের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করতে লাগলো। হার্বার্ট কোনো কথা না বলে হাঁটতে লাগলে বেটি শাপ শাপান্ত করতে করতে ওর পিছু নিলো। সন্ধ্যেবেলা সানবেরিদের বাড়ি এসে বেল বাজিয়ে বাজিয়ে পাগল করে দিলো সবাইকে। একদিন বেটি ঢিল ছুঁড়ে সানবেরিদের বসার ঘরের জানলার কাঁচ ভেঙ্গে দিলো। হার্বার্টের অফিসের ঠিকানায় ওকে গালমন্দ করে চিঠি লিখতে লাগলো।

অবশেষে হাল ছেড়ে একদিন বেটি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির হয়ে হার্বার্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে বললো তার স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়েছে এবং খোরপোষ দিচ্ছে না। এরপর হার্বার্ট কোর্ট থেকে শমন পেলো ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজিরা দেওয়ার। ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে দুজনেই দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পুরো ঘটনা বিবৃত করলো। ম্যাজিস্ট্রেটের ওদের দুজনের গল্প অদ্ভুত ঠেকলেও মুখে কিছু বললেন না। তিনি প্রথমে দুজনের মধ্যে একটা সালিসি করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হার্বার্ট অনমনীয়। কিছুতেই ফিরে যাবেনা বেটির কাছে। তখন ম্যাজিস্ট্রেট বললেন সেক্ষেত্রে তাকে বেটিকে প্রতি সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং খোরপোষ বাবদ দিতে হবে। গোঁয়ার গোবিন্দ ছোকরা তাতেও রাজী নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট তখন রাগ করে বললেন, ’তাহলে জেলে গিয়ে পচো’। পরের কেসে এরপর মনোনিবেশ করেন তিনি।

এর কদিন পর মহানুভব ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় আরেকবার তাঁর এজলাসে ডেকে পাঠান হার্বার্টকে বিষয়টা আরেকবার বিবেচনার জন্য। কিন্তু এক গোঁ ছোকরার। বেটি ওর সাধের ঘুড়ি নষ্ট করেছে। তাই জেলে যাবে কিন্তু একপয়সা ঠেকাবেনা ওকে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবার প্রকৃতই ক্রোধান্বিত হলেন।

‘আমার এই আইনী জীবনে তোমার মতো গর্দভ আর গোঁয়ার দুটো দেখিনি। এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার স্ত্রীর প্রাপ্য এ পর্যন্ত জমা টাকা শোধ করে দাও। আর একটাও অবান্তর কথা যদি তোমার মুখ থেকে শুনি, এই

দণ্ডে জেলে পাঠিয়ে দেবো'। আমাদের গোঁয়ার গোবিন্দ হার্বার্ট বাবু তো ঐসব ভালো কথা শুনলেনই না। তাই আমার বন্ধু নেড় প্রেস্টনের সঙ্গে তার জেলে পরিচয় ঘটলো আর আমিও বন্ধুবরের কাছ থেকে এই অভিনব গল্পটা শুনতে পেলাম।

গল্পটি শেষ করে নেড় আমার কাছে একটা প্রশ্ন রাখলো। 'কি মনে হলো তোমার গল্পটা শুনে? বেটি কিন্তু আদতে খারাপ মেয়ে নয়। বেশ কয়েকবার দেখেছি ওকে। কথাও হয়েছে। একদম স্বাভাবিক একটি মেয়ে। একমাত্র অস্বাভাবিকত্ব হলো স্বামীর ঐকান্তিক ভালোলাগা ও ভালোবাসার ঘুড়ির প্রতি উন্মাদপ্রতিম হিংসা। হার্বার্টও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ছেলে। গড়পড়তা ছেলেদের অপেক্ষা অনেক বেশী বুদ্ধি ধরে ও। কিন্তু এমন কি আছে ওর ঘুড়িতে বা ঘুড়ি ওড়ানোতে যা ওকে এমন উন্মত্তবৎ আচরণে বাধ্য করালো?'

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে আমি নেডের প্রশ্নগুলি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলাম। তারপর বলতে লাগলাম, শুধু নেড় প্রেস্টনকেই নয়, বুঝিবা নিজেকেও।

'সঠিক করে আমিও হয়তো বলতে পারবোনা, কেননা ঘুড়ি আমি কখনো ওড়াইনি। তাই ঘুড়ি ওড়ানো সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। তবে আমার মনে হয় ঘুড়ি ওড়ানোর মধ্যে হার্বার্ট একধরণের ক্ষমতার স্বাদ পেতো। সব ধরণের বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে, অনুকূল হাওয়ায় ভর করে মেঘের দেশের দিকে ভেসে চলেছে তার ঘুড়ি। হাতের দক্ষতায় সে শাসনে রাখছে তার ঘুড়ির গতিধারা। সেই সঙ্গে বুঝিবা স্বর্গের বাতাস ও তার ইচ্ছাধীন। ঘুড়ির সঙ্গী তার মন। সেও উড়ে চলেছে নিঃসীম শূন্য গগনে, দিগ্ দিগন্তের পানে। হয়তো কোনো অদ্ভুত ভাবে সে নিজেকে দেখতে পেত বা দেখতে চাইতো বাধাবন্ধহীন ঘুড়ির মধ্যে। হয়তো ঘুড়ি ওড়ানোর মধ্য দিয়ে প্রাত্যহিকতার একঘেয়েমী আর গ্লানি থেকে মুক্ত হতো তার মন। আবছা ভাবে হয়তো ঘুড়ি ওড়ানো তার কাছে বহন করে আনতো গায়ে কাঁটা দেওয়া রোমাঞ্চের অনুভূতি, অপার্থিব আনন্দ ও অনাবিল মুক্তির ভাব। ঘুড়ির পাখায় ভর করে মন তার উড়ে যেতো দূর থেকে আরো দূরে। আর তুমি জানো নেড়, মন যদি একবার সুদূরের পিয়াসী হয় কোনো রাজার ডাক্তার বা সার্জন সেই অসুখ থেকে তাকে সারিয়ে তুলতে পারেনা। বিপুল সুদূরের ব্যাকুল বাঁশি চিরকাল তাকে বাস্তবজ্ঞানরহিত করে রাখে। তবে এসবই হলো ভাবুক মনের কল্পনা। বাস্তবজগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তুমি বরং মানব মনস্তত্ত্বজ্ঞানসম্বলিত কোনো পণ্ডিতের দরবারে তোমার সমস্যা পেশ করো। তিনি আমার থেকে তোমাকে বেশী সাহায্য করতে পারবেন।

আরেক পাত্র কফি হয়ে যাক। কি বলো?'

A Swan Song

Subhalaksmi BasuRay

Encircled by a high wall, right in the middle of the bustling main street, was a Kali Bari. One entered its paved courtyard through a weathered, wooden door, in a section of the wall facing the street. To the right was a small Shiv Mandir, on the left an ancient well. Worshippers drew water from its cool depths, to wash before entering the Thakur Dalan. The temple was allegedly built by dacoits, who even in the 1960s lived in the dense Sal forests on the banks of the Damodar, terrorizing the countryside. The river had since changed its course and carved its way around the Balmer Laurie Paper Mills, on the edge of town.

The image of Goddess Kali was resplendent in dazzling "daaker saaj". Larger than life and ebony hued, she inspired awe rather than reverence in our childish hearts. I, for one, just couldn't shake off a feeling of apprehension, of being taken captive by burly, bare bodied outlaws with flaming eyes and wild hair, who could materialize out of the murky shadows, in an instant! Growing up, I had an imagination on overdrive! My brother and I were taken for visits to the temple at least twice a year, on our birthdays. Ma went more often and always on Shiv Ratri, dressed in "Gorod", bearing fruits, flowers and milk, in burnished bell metal utensils.

It was not quite winter when we celebrated Diwali. With shorter days and cooler nights, we had, by then, changed into our winter uniforms in school. The paddy fields on both sides of the Grand Trunk Road, which we took daily to go to school, now lay fallow. Neebulal, our mali had already planted the winter garden and Chrysanthemums were in bloom.
Since we had only one day off from school, we celebrated Kali Puja and Diwali all on the same day, waking up early to help with the preparations. Our first job was to dry the earthen lamps, which Neebulal left soaking in water overnight. Next, we rolled wicks for the lamps out of old rags. Pouring oil into the lamps from a jerrycan and climbing up a ladder to place them on the terracotta tiled roof of the house, were left to a pro, in our case, our mali. Once lit at nightfall, for one brief, enchanted period of time, we were transported to a world of sheer magic. A hundred, quivering lamps casting a warm glow on a moonless sky! Baba always bought us an assortment of firecrackers for the evening. Phuljhuri, Toobri, Charki , Rang mashal etc, creating a wondrous show of light rather than sound. Quite unlike the Diwalis we experienced in Delhi, in later years.

On a dusty road, which led out of the town to the village of Egara, stood a squat, gray building, the Burns Club. Every year its members celebrated Kali Puja and after the religious

ceremony, presented a play with multiple acts, which ran into the wee hours of the morning. My parents were invited every year and despite the fact that the following day was a school day, my brother and I were allowed to attend, as a special favour. Of course, we never stayed beyond the opening scenes of the play. As I recall, Bijoy Babu of the Accounts office, always took the lead role. Though my understanding of his lines was imperfect at that time, nonetheless, I was deeply moved by the passion of his delivery. Lengthy speeches, full of fire and brimstone, with much pacing of the floor and pumping of fists, sometimes heightened by special effects: pulsing lights, drum rolls and clangour of cymbals! Unfortunately, year after year we left before the play reached its denouement. The resolution, as always, was left to my imagination!

As the year drew to an end, I longed for the month-long winter vacation in school. Lazy, hazy days of soaking in the wintry sun, drowsed by the perfume of a garden in bloom, reading, but mostly day dreaming. Ah sweet deliverance!

আয়নায় মুখ দেখা

সুপর্ণা মজুমদার

দশ বছর হল এদেশে এসেছি। কিন্তু মশাই, আরাম কাকে বলে জানতাম না। মোটা মাইনের চাকরি, গাড়ি, মাঝারি সাইজের বাড়ি- সবই আছে। কিন্তু মনে সুখ ছিলনা। Pizza আর burger খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গিয়েছিল। দেশী রান্না যে জানিনা তা নয়, ইচ্ছে হলে করি, কিন্তু মশাই ঘরে spice এর গন্ধ আর sink ভরা ডাঁই করা pots and pans, ওসব আমার পোষায় না। বান্ধবীদের সঙ্গে পূর্বরাগের পর্বে যদি কেউ খেতে চায়, তবেই দেশী রান্না করি। ওই পর্বটা আমার অসহ্য লাগে – কোন রকমে চোখ কান বুজিয়ে কাটানো। তবে বান্ধবী জুটিয়েছি কম নয়। গতবার Christmas এ gift পেয়েছিলাম সাতটা আর card পেয়েছিলাম সতেরোটা।

তবে ওই। মেয়েগুলোর খাঁই বড্ড বেশী। Dinner এ নিয়ে যাও, dance এ নিয়ে যাও – নানা ভাবে তাদের মনোরঞ্জন করো। পয়সার শ্রাদ্ধ আর কি। কোন কিছু আর সস্তা নেই।

গত দশ বছরে আমার পরিবর্তনও কম হয়নি। সব থেকে প্রথম হল আমার নতুন নামকরণ, সমীরণ থেকে Sam. টাই বাঁধতে জানতাম না - এখন একটা perfect knot বাঁধতে কুড়ি সেকেন্ডও লাগেনা। নিজের ভাষা বলতে গিয়েও দেখি দুদশটা ইংরিজী শব্দ এসে যায়। যাক ও নিয়ে মাথা ঘামাই না, আমি এখন Sam চাউড়ি।

যাই হোক, বাড়ি পরিষ্কার, গাড়ি পরিষ্কার, আরামে থাকার উপায় ছিলনা মশাই। দেশ থেকে মা সমানে লিখে চলেছে প্যানপ্যানে চিঠি – "ওরে তুই কবে বিয়ে করবি। ওদেশী মেয়ে বিয়ে করলে কর, নয়তো আমি মেয়ে দেখছি।" একদিন দুত্তোর বলে রাজী হয়ে গেলাম। কাজটা ভালো করলাম কিনা – সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে মাসটাক সময় লাগলো। দেশে গিয়ে – এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। বিয়ে করে বউকে রেখে চলে এলাম। এইটুকুই আমার দায়িত্ব। বাকি সবই করলেন আমার শ্বশুর মশাই। মানসীর ভিসা পত্তর করানো, plane এর টিকিট কাটা, সব ওঁর দায়িত্ব।

একদিন ফোন পেলাম, শনিবার সকালে মানসী এসে পৌঁছচ্ছে, – Airport এ যেতে হবে। একটা date cancel করতে হল। Airport এ ওকে দেখে বুকের মধ্যে একটা দারুণ উল্লাস অনুভব করলাম। পানপাতার মতো মুখ – বিষণ্ণ। ভীরু চোখের দৃষ্টি। শাড়ি সিঁদুরে লটর পটর – ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছনো একটা মূর্তি। শনি, রবি দুদিন খুব দেখাশোনা করে ওকে চাঙ্গা করলাম। প্রচুর মিষ্টি মিষ্টি কথা বানিয়ে বানিয়ে বললাম। দেশী মেয়ের মন জয় করবার জন্যে dinner dance নয়, একেবারে অন্য পথ।

সোমবার থেকে সে আমার সম্পূর্ণ বশ। তার পর থেকে, well, I never looked back again. মশাই কী বলবো – তোফা আরামে আছি। অফিস থেকে যখনই বাড়ি ফিরিনা কেন, দেখি টেবিল সাজিয়ে অপেক্ষা করছে, oven এ গরম খাবার। আর সে খাবার – আঃ আপনাকে কী আর বলবো! সুক্তো, মুড়িঘন্ট, এঁচড়ের ডালনা – যখন যেটা বলি। তবে ওই এক ফ্যাচাং, নিজে নিজে দোকান বাজারটা করতে পারেনা। আমাকে নিয়ে যেতে হয়। মাঝে মাঝে ভাবি, গাড়ি চালানোটা না হয় শিখিয়ে দিই। দোকান বাজারটাও ওই করুক। আবার ভাবি, বেশী স্বাধীন হয়ে যাবে না তো?

একদিন গরম জলের ব্যাগ চাইলাম। ও ভয় পাওয়া চোখে তাকালো। বললাম, driveway তে বরফ পরিষ্কার করতে গিয়ে পিঠে লেগে গেছে। তারপর থেকে, আমার মতো পরিষ্কার driveway এ তল্লাটে আর কারো নেই। মাঝে মাঝে gift wrap এ মুড়ে জুতো জামা কোট কিনে আনি– যেগুলো হয়তো এমনিতেই কিনে দিতে হত। ও কিছু বলেনা (দেশী মেয়ে গুলো কি thanks বলতেও জানেনা?) খালি কৃতজ্ঞ চোখে তাকায়। বলি – "Darling, বাবা মায়ের জন্যে মন কেমন করছে নাতো? একটু টাকা জমলেই আমি আর তুমি দেশে বেড়িয়ে আসবো।"

মিষ্টি কথা শুনে ওর দুচোখ জলে ভরে আসে। হোঃ হোঃ – কেন যে acting এ গেলাম না! মুখের ভাব, গলার স্বরের পরিবর্তনে আমি perfection এ পৌঁছে গেছি। সিনেমায় নামলে উত্তমকুমারের পাশাপাশি আমার নামও লেখা থাকতো।

সেদিন office থেকে বেরোবার মুখে Clair এর সঙ্গে দেখা। সে বললো –

"Sam honey, খবর পেয়েছি, দেশ থেকে তোমার বউ এসে গেছে। So what! I like married men! জানো তো, তারা বিয়ে করো বিয়ে করো বলে চাপ দেয়না।"

ঘন্টা দু একের জন্যে ওর apartment এ গেলাম। বাড়ি ফিরে দেখি, মানসীর শুকনো মুখ, চোখে ব্যাকুল দৃষ্টি। বুদ্ধি করে বললাম – "Very sorry darling! বরফে ঠান্ডায় গাড়ি থেমে গিয়েছিল। প্রায় মাইল খানেক গাড়ি ঠেলতে হয়েছে – পা দুটো যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে।"

নিষ্পাপ মুখ করে মিথ্যে কথা বলা আমার ছোট বেলাকার অভ্যেস। আরে মশাই এটা survival এর যুগ। এই survival কথাটাকে পতাকার মতো উড়িয়ে, তার আড়ালে আমরা আমাদের যে কোন কুকাজ লুকাতে পারি। সে যাক্, তারপর কী হল শুনুন – সে কথা মনে পড়লে হাসির চোটে আমার পেটের নাড়ি ভুঁড়ি ছেঁড়ার যোগাড় হয়। ও নীচু হয়ে বসে আমার জুতো খুলতে লাগলো। হোঃ হোঃ স্নান করবার নামে তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে খুব খানিকটা হেসে নিলাম।

দিনে service ওর আর রাতে service আমার। মধ্যিখানের একটা বিরাট gap সন্ধ্যেটুকু। মানসী কেমন যেন ভিজে ন্যাতার মতো মেয়ে – বেশী কথাবার্তাও বলতে জানে না। ওই সময়টা বেশ boring লাগে। T.V. চলে, কাগজ পড়ি, মাঝে মাঝে office এর কাজের চাপ আছে বলে ঘন্টা দুয়েকের জন্যে বেরিয়ে একটা bar এ গিয়ে বসি। দুচার জন পুরনো বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়। মানসী জেগে বসে থাকে। এই এক জ্বালা। আজকাল আবার আমার অভিনয়ের মুখোশটা মাঝেমাঝে খসে পড়ছে, একটু সাবধান থাকতে হবে।

একদিন সে বললো, সারাদিন খুব ফাঁকা লাগে, সে university তে কোন একটা class নিতে চায়। আমি কোন রকমে "আচ্ছা খোঁজ নেবো খন" বলে কথাটা চাপা দিলাম। ওরে বাবাঃ তার মানে লেখাপড়া করতে গেলে তো সে আর আমার service এ থাকবেনা, আর খরচের ব্যাপারটাও তো আছে।

সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে একটা বিয়র নিতে kitchen এ গিয়ে দেখি, sink এ গোটা পাঁচ ছয় কাপ প্লেট। চমকে উঠলাম। কিছু জিগেস করার আগেই মানসী বললো –

"আজ দুপুরে চিত্রাদি এসেছিলেন, আরও দুতিন জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে। উনি আমার কলেজের এক বন্ধুর দিদি। ফোন করেই চলে এলেন। খুব হাসিখুশী মানুষ। খুব ভালো লাগলো আমার।"

এই প্রথম আমি কিছুক্ষণ কথা খুঁজে পেলাম না। মানসীর এখানে কোন বন্ধু বান্ধব হোক, আমি একেবারেই তা চাইনা। রাগে ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। আচ্ছা নির্লজ্জ মহিলা তো – বিনা নেমতন্নে একেবারে হুট করে চলে এলো?

এখানেই শেষ নয়, দুদিন যেতে না যেতেই সন্ধ্যেবেলা ফোন। মানসী ও ঘরে গিয়ে ফোনে কথা বলতে লাগলো। ওরে বাবাঃ – ঝাড়া পনের কুড়ি মিনিট ধরে কী হাসি গল্প। এ মেয়ে এত কথা বলতে পারে?

ফোন রেখে এঘরে এসে বললো –

"চিত্রাদি ফোন করেছিলেন। অনেক করে একদিন ওঁদের বাড়ি যেতে বললেন। নিয়ে যাবে একদিন?"

মুখে শুকনো হাসি জোর করে এনে বললাম –

"নিশ্চয়। কাজের চাপটা একটু কমুক।"

দেশীগুলোর সঙ্গে তো কোনদিন যোগাযোগও রাখিনি। আমার কথা কে কতদূর কী জানে, কে জানে! মানসীর কাছে সব ফাঁস করে দিলেই হয়েছে আর কী।

মানসী আর কিছু বলেনা। ওর ওপর ক'দিন তীক্ষ্ণ নজর রাখি। হাবেভাবে কোন পরিবর্তন হয় কিনা। কয়েক সপ্তাহ গেলে নিশ্চিন্ত হই। না সব ঠিক আছে।

পুরনো বান্ধবীদের মধ্যে বেশ কয়েক জনের সঙ্গেই যোগাযোগ আছে। মানসী আর একা একা লাগছে বলে complain করেনা – আমিও তাই অফিসের কাজে tour এর নাম করে প্রায়ই এদিক ওদিক যাই। একবার তো পুরো একটা weekend লিজার flat এই বন্দী ছিলাম, হাঃ হাঃ, একই শহরে। This is heaven!

এই একটা বছর মানসী খুব ভালো service দিয়েছে। Reward হিসেবে ওকে একটা credit card করে দিয়েছি। প্রথম প্রথম ওর খরচের দিকে নজর রাখতাম। নাঃ ভয় নেই। ওই ভিজে ন্যাতার মতো মেয়ে মাসে পঞ্চাশ/একশোর বেশী খরচ করেনা। এ ব্যবস্থায় সে বেশ খুশী মনে হয়, সাজ পোষাকে একটু পারিপাট্য, মুখে হাল্কা প্রসাধন, চেহারাটা খুলেছে। তবে চুলে কাঁচি চালায়নি। ওর ওই লম্বা চুলের বেনীটা আমার অসহ্য লাগে। সে যাক্ গে – একদিন ঠাট্টার ছলে বলে দিলেই হল, বোকাটা হয়তো পরদিনই গিয়ে চুল কেটে আসবে।

এমনি সুখে যায় যদি দিন যাক্ না। বাইরে খাওয়া দাওয়া ঘোরা ফেরার খরচ কমে গিয়ে bank account ও এখন বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কিন্তু এভাবে দিন গেলোনা। আমার পুরনো বান্ধবীদের একজন – জুডি, একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেললো। বছর পাঁচেক আগে এই মেয়েটি আমার প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছিলো, এবং আমাকে বিয়ে করবার জন্যে বহু সাধ্যসাধনা করেছিলো। ওর প্রতি যে আমার দূর্বলতা ছিলো না তা নয়, কিন্তু মশাই আমার বিয়ের নামে আতঙ্ক। জুডি যখন দেখলো, আমি বিয়ের নামে নেই, শুধু ফুর্তির বেলায় আছি, তখন দুম্ করে একটা মাথামোটা বনমানুষকে বিয়ে করে ফেলেছিলো। তা সেই জুডি একদিন সন্ধ্যেবেলা হাঁউমাঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে একটি ছোট ব্যাগ হাতে আমার বাড়িতে এসে হাজির। বরের সঙ্গে কোনদিনই বনিবনা হয়নি। ঝগড়া ঝাঁটি লেগেই ছিলো, ইদানীং অবস্থা চরমে উঠেছে। মারধোর শুরু হয়েছে। আজ ও কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছে। আমার বাড়িতে ক'দিন থেকে একজন উকিলের পরামর্শ নিয়ে বরটাকে ডিভোর্স করতে চায়।

আমি যেই আমতা আমতা করতে লাগলাম, জুডি পাগলের মতো আমাদের পুরনো দিনের অনেক ঘটনার দোহাই দিয়ে, আমার মনুষ্যত্বের কাছে আবেদন জানাতে লাগলো। কী আর করি, basement টা ফাঁকাই, ওখানে ওর থাকার জায়গা করে দিলাম। টেলিফোন করে ওর জন্যে বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে দিলাম। শুধু তাই নয়, ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সারা রাত ওর কাছেই কাটালাম। জুডি আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলো সর্বহারা মানুষের মতো। পরদিন সকালে মানসীর মুখের দিকে তাকাতে পারিনি, তাই জানিনা ওর চোখে মুখে কী ছিলো।

সারা রাত আমার কাছে থাকবার পর জুডি বিদায় নিলো; আমি ওকে ওর মায়ের কাছে পৌঁছতে সাতশ মাইল পাড়ি দিলাম গাড়ি নিয়ে। ফেরার পথে সারাক্ষণ ভেবেছি, কী ধরণের অভিনয় এখন প্রয়োজন মানসীকে এই কদিনের কথা ভুলিয়ে দেবার জন্য। আমার নিষ্পাপ মুখ দেখে ও নিশ্চয় সব ভুলে যাবে, after all আমি ওর স্বামী।

চাবি খুলে বাড়ি ফিরে দেখি ও নেই। একটি ছোট চিঠি – মানসী বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, পাশেই অন্য একটি শহরে আছে, ঠিকানা দেয়নি। হ্যাঁ, আর আছে উকিলের একটি চিঠি, ডিভোর্সের কাগজ পত্র এবং আমার বাড়ি এবং সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক অধিকারের দাবী।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও বোধহয় এতটা অবাক হতামনা। ভেবেছিলাম, প্রচন্ড রাগ হবে, কিন্তু হল না। অন্ধকার living room এ কিছুক্ষণ বসে থেকে আস্তে আস্তে bedroom এ গেলাম। দুচার খানা শাড়ি জামা ছাড়া বোধহয় আর কিছুই নেয়নি। বিয়েতে দেওয়া আংটিটা ফেলে গেছে dressing table টার ওপর। এদিক ওদিক কিছু কাগজপত্র ছড়ানো। কিছু চাকরির দরখাস্ত। মানসী কিছুদিন ধরেই নানা শহরে চাকরির জন্য application পাঠাচ্ছিল। জানতাম না। জানতাম না মানসীর Computer Science এ Masters degree আছে। বিয়ের সময় শুনেছিলাম বটে কী একটা Science এ কী একটা ডিগ্রি আছে, সেটা যে কী – জানার প্রয়োজন বোধ করিনি। ওকে তো মানুষের মধ্যেই কোনদিন গণ্য করিনি।

সহসা ঘরের আবছা অন্ধকারটা যেন ভারী একটা দানবের মতো বুকে চেপে বসলো। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। একটা নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে উপলব্ধি করলাম, ওই ভিজে ন্যাতার মতো মেয়েটাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। আমার জীবনের প্রথম ভালোবাসা। আমার সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, মানসী তুমি শুধু আমাকে ক্ষমা করো। এই বাড়ি নাও, আমার যা কিছু আছে সব নাও। যদি আমাকে সহ্য করতে না পারো আমার কাছে তোমায় আর কোনদিন ফিরেও আসতে হবেনা, শুধু আমায় ক্ষমা কোরো।

****

তালের ফুলুরি *

ইন্দ্রাণী চৌধুরী

ফি বছর, এই সময় দেশের থেকে মা ফোনে জানাবে যে পাশের বাড়ির তালগাছ থেকে ধুপ-ধুপ করে তাল আমাদের বাড়ির দেয়ালের এদিকে পড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই একই কথা! আমি খানিকটা 'বেল পাকলে কাকের কি' গোছের ঔদাসিন্য দেখিয়ে মার কথা শুনেও শুনিনা! আরও বলবে যে তাল মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেলেও ওরা তুলে নিয়ে আসে না কারণ বাড়িতে কেউ নাকি খাবার নেই! কাঁহাতক এমন কথা সহ্য করা যায়, বলুন তো? আমি পড়ে আছি কোন বিদেশ-বিভুঁইয়ে, এখানে এই ধরনের কথার তীর বুকে এসে কিভাবে বেঁধে, তা শুধু আমার মত হতভাগ্যরাই বুঝবে! কিন্তু মার ওপর বেশি রাগ করতে পারিনা কারণ জানি যে সে সরল মনেই আমাকে দেশের হালচাল জানাচ্ছে যার মধ্যে এই পাকা তাল মাটিতে পড়ার কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ! বললাম- 'একবার নিয়ে এসে তালের ফুলুরি বানাও; বানিয়ে দুটো তোমার গোপালকে দাও আর বাকি তোমাদের বহুতল বাড়ির সবাইকে বিলিয়ে দাও, যদি ঘরে কেউ খাবার না থাকে'।

আশা করলাম এই বিষয় নিয়ে আলোচনার এখানেই সমাপ্তি। দুদিনের মধ্যে আবার খবর, তাল নিয়ে এসে বানানো হয়েছে। আহা, সেই তালের কি স্বাদ আর গন্ধ। যারা খায়না, তারাও খেয়েছে, আর সবাই ধন্য-

ধন্য করেছে। এবার আর মাকে পায় কে- প্রতি সপ্তাহেই তাল কুড়িয়ে এনে বাড়িতে তালোৎসব হচ্ছে। বুঝলাম গোপালেরও মনে ধরেছে মা'র তালের ফুলুরি, তাই এইভাবে মা'র ভাগ্যে তালের প্রাপ্তিযোগ! সব শুনে ক্ষোভে-দুঃখে এ বছর মরিয়া হয়ে তালের খোঁজ শুরু করলাম এ দেশে বসে! Online কেনাকাটার যুগে এটা একটা কোন ব্যাপার হ'ল নাকি?! আগে থাকতে ভেবেও নিলাম সেই তাল পেলে মার কাছে কি ভাবে গল্প করব।

কিন্তু যতটা সহজ ভেবেছিলাম, বাস্তবে ততটা সহজ হ'লনা। প্রথম কথা আমার মত এরকম মরিয়া-আকুল প্রাণা প্রাণী এ জগতে খুব বেশি নেই যাদের দৌলতে online তালের ব্যাবসা রমরম করে চলবে। তাই দেশের মধ্যে যাও-বা দু-একটা online দোকান চোখে পড়ল, বিদেশে রপ্তানি তারা কেউ করেনা। এবার খুঁজলাম কানাডার মধ্যে যদি কোন দোকান থাকে। আরে বাহ, এই তো একটা আছে- তা Edmonton হলে কি হবে, আছে তো! তাদের অবশ্য তাল নেই, আছে পাল্প অর্থাৎ কাই, বোতলে ভরা। তাই সই। দুটো বোতল নিয়ে, নাম- ঠিকানা দিয়ে, দাম দেবার শেষ পর্বে চলে এসেছি যখন, তখন ওই online দোকান জানাল- 'আপনি যে বস্তুটি পছন্দ করেছেন, সে বস্তুটি অত দূরে পাঠান সম্ভব নয়, আপনি অন্য কিছু পছন্দ করুন। 'ধুত্তেরী তোর নিকুচি করেছে, "অন্য কিছু"'! online shopping এর আশা ত্যাগ করলাম। পাশাপাশি স্থানীয় চেনা দোকানের মধ্যে খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। একজনের থেকে খবর নিয়ে একটা দোকানে গেলাম। গিয়ে শুনলাম তারা আসলে দেশের থেকে তালশাঁস আনে, আর তার মরশুমও এখন শেষ! এইভাবে হাল যখন একেবারে ছেড়ে দিয়েছি, আমার এক বন্ধু খবর দিল সে অনেকদিন আগে এক শ্রীলঙ্কান দোকানে বোতলে তালের পাল্প বা কাই পেয়েছিল। ভাবলাম শেষ চেষ্টা করে দেখি। গেলাম দোকানে। কি চাই জানাতে দোকানদার অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর, 'wait' বলে অন্যদিকে চলে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম যে সারিতে সেখানে সমস্ত টিন ও বোতল ভর্তি ফল, ফলের রস বা কাই রয়েছে। অতএব বুঝতেই পারলাম দোকানদার কিছুই না বুঝে অন্য দিকে চলে গেছেন। কয়েকটা অপ্রয়োজনীয় জিনিস হাতে তুলেছিলাম, সে গুলোরই দাম মেটাতে কাউন্টারের সামনে যখন এসেছি, দেখি ভদ্রলোক হাতে করে একটা বোতল এনেছেন; গায়ে লেখা- 'palm paste'! সত্যি সত্যি পেয়ে যাব, ভাবতে পারিনি- তাই নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলামনা, চশমা পরে আবার পড়লাম। হ্যাঁ, পাম পাল্পই বটে। লম্বা- কালো ভদ্রলোক দেবদূতের হাসি (আমার চোখে সেরকমই লাগল) হেসে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। হাতে আরো একটা জিনিস- তাল গুড়। আনন্দের চোটে অনেকবার হিন্দি, ইংলিশ এমনকি বাংলাতেও ধন্যবাদ দিয়ে, দুটোই নিয়ে নিলাম। ঘরে তাল পাল্প আর তাল গুড়- দুটোই চলে এসেছে, এবার দিনক্ষণ দেখে শুধু বানাবার অপেক্ষা!

শেষপর্যন্ত বিদেশের মাটিতে আমার প্রথম বানানো হ'ল তালের ফুলুরি। মা-কে একেবারে বানিয়ে, ছবি পাঠিয়ে তাক লাগিয়ে দিলাম। মা-র ওপর রাগ করে এই দুর্লভ বস্তুটার সন্ধান শুরু হয়েছিল, কিন্তু সত্যি বলতে কি মার জন্যই তালের ফুলুরি খাওয়া হোল অনেক বছর পর।

তালের ফুলুরি খাওয়া হ'ল আর আমার গল্পের নটে গাছটিও মুড়ল! খেতে কেমন হয়েছিল- সে আরেক গল্প!

- সম্পাদিকার মন্তব্য – জনমত - বহুদিন পরে অপ্রত্যাশিতভাবে তালের বড়া যারা খেয়েছে তারা সবাই চমৎকৃত।

কোচিনে অবিস্মরনীয় কয়েকটি দিন *

-ঝর্ণা চ্যাটার্জী

কোচিনে বেড়াতে যাব শুনে এক বান্ধবী বলল “তোমরা বোলগাটি প্যালেসে থেকো, খুব ভাল লাগবে”। শুনে ভাবলাম নিশ্চয়ই, দেখব কেমন বোলগাটি প্যালেস। অনেক বছর আগে আমরা যখন অজন্তা-ইলোরাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম বম্বে (মুম্বাই) থেকে, তখন আওরঙ্গাবাদে একটা হোটেলে ছিলাম – যেটা তার পূর্বজীবনে ছিল এক প্রাসাদ – চার দিকে চমৎকার বাগান দিয়ে ঘেরা। ভিতরে স্থানীয় শিল্পের নিদর্শন দিয়ে সাজানো। খুব ভাল লেগেছিল সেখানে। হয়তো এটাও তেমনি হবে।

গিয়ে দেখলাম বোলগাটি প্যালেস অন্য রকম, কিন্তু সুন্দর, খোলা মেলা। আরব সমুদ্রের ধারে, একটা ছোট্ট দ্বীপের মধ্যে, নৌকো করে একটুখানি জল পার হয়ে সেখানে যেতে হয়। হল্যান্ডের বাইরে বৃহত্তম, ভারতের প্রাচীনতম ডাচ প্রাসাদ ছিল এককালে। ডাচ বণিকেরা তৈরী করিয়েছিল ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে। তার পর এককালে ছিল ডাচ মালাবারের কম্যান্ডারের বাসস্থান। আরও পরে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশদের লীজ দেওয়া হয়, স্থানীয় বৃটিশ শাসকদের (রেসিডেন্টদের) থাকার জন্য। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রাসাদ ঐতিহাসিক হোটেল বা রিজর্টে পরিণত হয়েছিল।

বোলগাটি প্যালেস (ইন্টারনেট)

আমরা আসল প্রাসাদে না থেকে ঠিক করলাম সমুদ্রের ধারে একটা ছোট কটেজে থাকব – শোবার ঘরের জানালা দিয়ে জেলে-নৌকো আর প্রমোদ-তরণী দেখা যায়। সন্ধেবেলা আমরা একটা নৌকো ভাড়া করে একটু ঘুরে এলাম। ফিরে দেখি বিশাল ব্যাপার। বিদেশে থাকে একটি ছেলে – বড়লোক বাবা-মা, ঠাকুর্দা-ঠাকুমা। বছর খানেক হোল চাকরী শুরু করেছে লেখাপড়া শেষ করার পরে। চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট বড় কোম্পানীতে। সে দেশে ফিরে এসে বিয়ে করবে এই ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য এসেছে এই হোটেলে, বোলগাটি প্যালেসে। তার ভাবী বধূ এ্যামেরিকান। সে এবং তাদের দুজনের বেশ কিছু এ্যামেরিকান ছেলে ও মেয়ে বন্ধু এসেছে সেখান

থেকে বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে। আমাদের সাথে আলাপ হোল কয়েক জনের, তার মধ্যে দুটি ছেলে-মেয়ে ডাক্তার। ওদের সবার সাথে আলাপ হয়ে ভারী খুশি হলাম আমরা। মিশুক, ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের সশ্রদ্ধ কৌতূহল। ঘাটের সিঁড়িতে বসে গল্প হোল, চা-জলখাবার খেলাম সবাই একসাথে।

বিয়ে হবে দিন তিন চার পরে। পাত্র-পাত্রী দুজনের বাবা-মা আসবেন দু দিন পরে। মেয়ের বাবা-মা এই সুযোগে দিল্লী-আগ্রা-জয়পুর দেখছেন। আর ছেলের বাবা-মা আসবেন মুম্বই থেকে, ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ শেষ করে।

পরের দিন ভোর বেলা আমরা দল বেঁধে এক সাথে ব্রেকফাস্ট খেলাম। এত রকমের গল্প হোল যেন কতদিনের চেনা সবাই। দুটি মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি তাদের শাড়ি পরতে সাহায্য করব কিনা – উত্তর দিলাম 'অবশ্যই করব, সানন্দে'। ওরা বলল ওরা সমুদ্রে স্নান করতে যাবে – এত গরম জল! বাথটাবের মত আরাম লাগবে। আমরা ওদের একটু সাবধান করে দিলাম বেশি নির্জন জায়গায় না যেতে আর জামাকাপড় সম্পর্কে একটু কম "এ্যাডভেঞ্চারাস" আর কম আধুনিক হতে। ওরা শুনে হাসল, মজা পেয়ে।

সন্ধেবেলা আবার দেখা হোল, কিন্তু সবার সাথে নয়। পলা আর মিশেল এই দুটি মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রচন্ড চিন্তা সবার – কি হোল, কোথায় গেল তারা। কাউকে না বলে কি ওরা সাইট-সীয়িং বা শপিং করতে গেল? সেটার সম্ভাবনা কম, কিন্তু সব রকমের ভাবনাই মাথায় আসছে। ঐ মেয়ে দুটির খুব ভাব, এক সাথে এক ঘরে রয়েছে, ছোট বেলা থেকে বন্ধুত্ব, এক স্কুলে পড়ত। যারা ফিরে এসেছে সমুদ্র স্নানের পরে তারা সবাই এক জায়গায় ছিল মোটামুটি, ওরা দুজনে গিয়েছিল আর একটু দূরে, আর বলেছিল সুযোগ পেলে হয়তো একটু নৌকায় করে কাছাকাছি ঘুরে আসবে। এ দিকে যত সময় কাটছে তত চিন্তা বাড়ছে সবার। পুলিশে খবর দেওয়ার প্রসংগ উঠলে হোটেলের ম্যানেজার বলল তার চেনা একজন অফিসার আছে তাকে সে ফোন করবে। মিনিট দশেক বাদে সে ফিরে এল, মুখ গম্ভীর।

শোনা গেল মুম্বইতে ছত্রপতি শিবাজী রেল স্টেশনে আর 'তাজ' হোটেলে কয়েক জন বন্দুকধারী লোক হঠাত আক্রমণ করেছে। গোলাগুলি চলছে, স্টেশনে বেশ কিছু লোক মারা গেছে। হোটেলের লোকেরা নিজেদের ঘরে দরজা বন্ধ করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। সেখানে আহত-নিহতের সংখ্যা কেউ জানে না এখনও। কর্তৃপক্ষ মনে করছে যে কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে এরা নৌকায় এসেছে, সম্ভবতঃ পাকিস্তান থেকে। পরে জানা গিয়েছিল যে এরা কোন কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী দলের লোক। নোঙ্গর ফেলেছে গেট ওয়ে অব ইন্ডিয়ার কাছে। মুম্বইএর পুলিশ বিপর্যস্ত এই ঘটনা সামলাতে, কোচিনের থানাতে অফিসাররা 'অন কল', স্থানীয় লোকজন, ট্যুরিস্ট এবং দোকানদারদের সাবধানে থাকতে বলেছে তারা। এমন অভাবনীয় গুরুতর ও বিপজ্জনক ঘটনার সন্মুখীন হয়ে আমরা সবাই স্তম্ভিত। অসহায় বোধ করছি।

জানি না কত সময় কাটল এমনি করে, জটলা পাকিয়ে বসে আছি সবাই লাউঞ্জে। কারো চোখে ঘুম নেই, কারো নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। হঠাত বেশ গভীর রাতে একটা শব্দ পাওয়া গেল ঘাটের দিক থেকে। দলের দুটি ছেলে দৌড়ে গেল সেখানে, কি ব্যাপার জানবার জন্য। মিনিট কয়েক পরে ফিরে এল তারা, সাথে করুণ মূর্তি, বিদ্ধস্ত চেহারা – সেই দুই মেয়ে।

ডাক্তার মেয়ে লিসা তাড়াতাড়ি ওদের প্রাথমিক পরীক্ষা করে বলল যে কোন আঘাত বা দৈহিক ক্ষতি হয় নি মনে হয়। আর এ ছাড়া সবার কিছুটা কান্না, হাসি, ওদের জড়িয়ে ধরে বার বার বলা "তোমরা ঠিক আছ? কি হয়েছিল? কোথায় ছিলে তোমরা?" – এ সব চলল। শেষ পর্যন্ত আমরাই ওদের বললাম, "তোমরা একটু শান্ত হও, ওদের একটু সময় দাও সামলাতে, তার পরে জিজ্ঞেস কোরো সব কিছু"। হোটেলের ম্যানেজার সে কথা সমর্থন করে অনেক খানি লেমনেড আর কিছু জলখাবার আনালেন। ওরা ওদের ঘরে গিয়ে স্নান করে, পরিস্কার জামাকাপড় পরে ফিরে এল। আমাদের কাছে বসে একটু লেমনেড আর জল খেল।

তার পর আস্তে আস্তে ওদের কাহিনী জানা গেল। ওরা বালির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দল থেকে একটু দূরে চলে গিয়েছিল, জায়গাটা নির্জন। সেখানে দুটো নৌকা দেখে ওরা ভাবল জেলে নৌকাই হবে, একটু যদি ঘুরে আসা যায় ওদের সৌজন্যে, তবে বেশ হবে। কাছে গিয়ে কথা বলবে ভেবেছিল ওরা। কিন্তু কাছাকাছি হতেই চারজন লোক বেরিয়ে এসে ওদের জোর করে ধরে নিয়ে গেল নৌকার মধ্যে। ওদের হাত-পা বাঁধা হোল সাথে সাথে। চোখ-মুখ বাঁধার প্রয়োজন মনে করে নি তারা কে জানে কেন। হয়তো এত নির্জন জায়গায় অন্য কারো আসার সম্ভাবনা কম এই মনে করে। নিজেদের মধ্যে উর্দুতে কথা বলছিল তারা - কি কি করতে হবে সেই ব্যাপারে। মুম্বইতে কাজ আছে, তার পরে ফিরে এসে এই মেয়েদের নিয়ে একটু 'মজা' করা যাবে – এই তাদের প্ল্যান ছিল। মুখ একটু ফিরিয়ে এক বীভৎস দৃশ্য দেখেছিল ওরা – দুজনের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে। তাদের চেহারা ও পোষাক দেখে মনে হয়েছিল জেলে বা মাঝি ছিল তারা। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না ওরা, কিন্তু ভয় পেলে চলবে না, আর অন্যদের সাহায্য পাবার আশা কম, এই চিন্তাটুকু মাথায় ছিল। খানিকক্ষণ পরে জলের শব্দ থেকে বুঝল ওদের বেঁধে রাখার পরে সেই চারজনই চলে গেল – অন্য নৌকায় করে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন তারা ফিরল না, তখন সাহস করে ওরা নিজেদের বাঁধন খুলতে পেরেছিল ধীরে ধীরে। তার পর অন্ধকারে শুরু করেছিল আবার বালির মধ্য দিয়ে ফিরে আসতে – কখনও দৌড়ে, কখনও পাথরে বা ঝিনুকে হোঁচট খেয়ে, আর কখনও চুপিসাড়ে, বোলগাটি প্যালেসের ঘাটের দিকে। এই পর্যন্ত বলার পরে মিশেল হঠাত বমি করতে শুরু করল, কিছুতেই থামতে পারে না। সে বলল যে সেই দুই মাঝির রক্তাক্ত মৃতদেহ তার সারাক্ষণ মনে পড়ছে – যারা আর ঘরে ফিরে যেত পারল না।

তার পরের দিন জানা গেল মুম্বইতে এই সব গোলমালের জন্য ছেলের বাবা-মা আসতে পারবেন না। মেয়েটির বাবা-মাও আসতে ভরসা পাচ্ছেন না। কিন্তু এই সব ছেলে-মেয়েদের পক্ষেও বার বার অত দূর থেকে আবার আসা সম্ভব না। বিয়ে স্থগিত রাখা নিয়ে অনেক আলোচনার পরে পাত্র-পাত্রী সিদ্ধান্ত নিল যে আড়ম্বর হবে না, কিন্তু বিয়েটা হবে। তাই ম্যানেজারের সহায়তায় বিয়ের আয়োজন হোল। আমরা যথা সম্ভব ওদের আত্মীয়-স্বজনের অভাব পূরন করার চেষ্টা করলাম। বিয়ে হয়ে গেল। আমরা যে যার জায়গায় ফিরে গেলাম একটা অদ্ভুত ঘটনার স্মৃতি নিয়ে।

*এই গল্পটির মধ্যে প্রচুর কল্পনার খাদ মেলানো হলেও কিছু কিছু তথ্য বা সত্য আছে।

আজকের কবিতা

অমর কুমার

পৃথিবী দেখেছে অনেক
দেখেছে মানব সভ্যতার উত্থান পতন
ইতিহাসের বিচিত্র ভাঙ্গা গড়া ;
প্রকৃতির কান্না, দুর্ভিক্ষ মহামারী গণহত্যা
দেশে দেশে নিরপরাধ মানুষের আর্তনাদ
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া
সয়েছে বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধ, পারমানবিক বিপর্যয়
হিংসা, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব অনৈক্য
বিচ্ছিন্ন বিভাজিত জাতি, ক্ষমাহীন বর্বরতা
ধনী দরিদ্রের দুস্তর ব্যবধান, অমানবিকতা।
এ পৃথিবী নীরবে দেখেছে অনেক ।।
তবু বিস্ময় আজ,
বিস্ময় পৃথিবীর অবাক চোখে
অচিন্তনীয় অনির্বচনীয় দৃশ্য;
মানব জাতির আজ অন্য রূপ
একবিংশ শতাব্দীর মানুষ বন্দি খাঁচায়
মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত তবু কত অসহায়।
চোখে চোখে জল ভরে যায়--

অষ্টশত কোটি মানুষ আজ একই সূত্রে আবদ্ধ
এক নিয়ম এক অনুশাসন এক বিধানে ঐক্যবদ্ধ,

একই সুরে গান গায়
একই কথা বলে যায়
করোনার মায়াজালে বিশ্ব মানব বুঝি মন্ত্রমুগ্ধ
হেঁটে চলে যায় আগুনের উপর দিয়ে
আতঙ্কিত সন্ত্রস্ত, ঊর্ধ্বমুখী, শ্বাস রুদ্ধ ।

আশার অনুজ্জ্বল আলো তবু চোখে –
জাতি বর্ণ ধর্ম ধনী দরিদ্র নারী-বৃদ্ধ নির্বিশেষে।
বস্তির অভুক্ত অনাথ শিশু থেকে আরব প্রিন্স
পতিতা নারী থেকে পথের ভিখিরি, জেলের কয়েদী।
মানুষ দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত অগ্নি গহ্বরের সামনে
জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ – পিছনে যাবার পথ আজ বন্ধ।

কম্পমান ক্ষীয়মাণ প্রদীপ শিখা হাতে হাতে
প্রজ্বলিত শিখাই আজ মানব জীবনে আশার প্রতীক।
এ যেন আলাদিনের অত্যাশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক প্রদীপ --
যে প্রদীপ সন্ধান দেবে করোনা প্রতিরোধক এক ভ্যাকসিনের
যে প্রদীপ ফিরিয়ে দেবে বিপন্ন মানবজাতিকে তার অহংকার
যে প্রদীপ উপহার দেবে মানুষকে তার লুপ্ত চেতনা ও মানবিকতা।।

(রচনা কাল- জুলাই ২০২০)

বাড়ি ফেরা

মধুমিতা ঘোষ

ছোটবেলায় আমার তিনটে বাড়ি ছিল, ঠাকুমার বাড়ি, মামার বাড়ি, আর আমার বাবার চাকরীসূত্রে, বিভিন্ন শহরে আমাদের ভ্রাম্যমান যাযাবর বাড়ি। আজ নিজে সংসারী হয়েও, আমার সেই তিনটে বাড়িই রয়ে গেছে। মা এর বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি, আর আমার কর্তার চাকরীসূত্রে, এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়ানো, আমার নিজস্ব যাযাবর বাড়ি।

সেই সময়, বছরে দুবার আমরা দুই বাড়িতে যেতাম, একবার ঠাকুমার বাড়ি, আরেকবার মামার বাড়ি। সে তখন এক বিশাল এডভেঞ্চারাস ব্যাপার, কদিনের জন্য যাব, কি নেব, কি পরব, কার জন্য কি কি যাবে, সাত দিন আগে থেকে মোটামুটি সব গুছিয়ে নিয়ে, বাবা দুটো ঢাউস ভিআইপি ব্যাগ এ সব ভরত। আমি আর দিদি নাচতাম, ক'দিনের জন্য সব কিছু থেকে ছুটি পাওয়া যেত বলে, আর প্রচুর মজা করব বলে। তখন বাহুল্য ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতা ছিল।

সেই সময় সমসাময়িক পাড়ার বা স্কুল এর বহু বান্ধবীদের, আদি বাড়ি বা মামার বাড়ি বহরমপুর শহরেই হওয়াতে, তাদের সেই সুযোগ আসত না। তাই কত জন খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করত, জানতে চাইত আমাদের এই বেড়ানোর অভিজ্ঞতা। ছোট শিশু মন, অন্যের বেড়ানোর গল্পে, আনন্দ খুঁজে নিত নিজের মত করে।

নাহ্, বাড়ি ফেরার টান অনুভব করার মতো বয়স তখনও হয়নি, বুঝতামও না, আমার কাছে তখন ঠাকুমার বাড়ি, মামার বাড়ি যাওয়া মানেই নির্ভেজাল আনন্দ। খালি দেখতাম, ঠাকুমার বাড়ি গিয়ে, আমার রাগী বাবা, কিচ্ছু বলত না আমাদের। সকালে নিমের দাঁতন নিয়ে, আমায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ত গ্রাম চেনাতে। তারপর পুরোনো বন্ধুদের সাথে দেখা করে, বাজার করে, কত ঘুরে ফিরে আসত বাড়িতে। সারাদিন কত পুরোনো জমা গল্প, উঠে আসত ঠাকুমা আর বাবার কথায়। যেন কত জমা স্মৃতি নতুন হয়ে উঠত সেইসব দিনে।

একই জিনিস দেখতাম মামার বাড়ি গেলেও, মা তখন অন্য মানুষ। বেড়ানো, গল্প, আড্ডা, মা তখন আনন্দে ঝলমল করত, সবাইকে একসঙ্গে পেয়ে। নিজের জায়গা, নিজের পাড়া, মা তখন তারুণ্যে ভরপুর। আর শুধু দেখতাম কেন বলছি, এবারও দেখলাম, আমার ষাটোর্ধ মা, আজও নিজের জায়গাই ফিরে গিয়ে, নিজের সব বার্ধক্যজনিত শারীরিক অসুস্থতা গুলো কেমন ভুলে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার আনন্দ এমনিই হয়।

আসলে আমরা সবাই একটা সময় নিজের নিজের বাড়ি ফিরতে চাই। নিজের শেকড়ে ফিরতে চাই। যেমন চেয়েছিল আমার বাবাও। আজীবন বাবা ভাবত, কোনোদিন হয়তো বাবা, আবার সেই গ্রামের বাড়ি ফিরে যাবে, আগের মত। নাহ্, বাবার আর ফেরা হয়নি। কে জানে হয়তো এই পৃথিবীর যাযাবর সংসারটার মায়া কাটিয়ে, বাবা পরপারে সত্যি নিজের বাড়ি ফিরে গেছে। আমার বয়স্কা দিদি শাশুড়ি মানুষটি, অ্যালঝাইমার

যখন তার সব বর্তমান স্মৃতিটুকু কেড়ে নিয়েছিল, সেই বৃদ্ধা, কি নিপুণ বর্ণনায় গল্প বলত এক চঞ্চলা বিবাহিত কিশোরীর, বিয়ের পর তার বাবার হাত ধরে বাড়ি ফিরছে সে। সেখানে তার আসার আনন্দে, তার বাবা চার রকম মাছের আয়োজন করেছে। সবটুকু স্মৃতি বিস্মৃত হয়েও সে মনে রেখেছিল, বাবার হাত ধরে বাড়ি ফেরা টুকু। আমার দিদিমা, মৃত্যুর আগে অবধি মনে রেখেছিল, তারা চার অল্প বয়সী জা এ মিলে, শ্বশুর বাড়িতে কি কি করত, কি অনায়াসে দিদা গল্প বলে যেত পুরোনো বাড়ির, পুরোনো ঘটনাবলীর। আমার ঠাকুমা মানুষটি তাঁর শ্বশুর কে দেওয়া কথা রাখতে, আমৃত্যু নিজের ভিটে মাটি ছেড়ে কোথাও গেলই না কোনোদিন, কিন্তু সেই মানুষও গল্প বলত, ৯ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে পেছনে ফেলে আসা বাবার বাড়ির। হয়তো মানুষ গুলো সবাই মনে মনে সবসময় বাড়ি ফিরতে চাইত, পুরোনো সময় এ ফিরতে চাইত, জীবনে একবার হলেও।

আমাদের মামার বাড়ি, ঠাকুমার বাড়ি ফেরার আনন্দটুকু খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত মনে হত। আবার তোড়জোড় শুরু হত যাযাবর সংসারে ফেরার। আমার সংসারী মা আবার সব গুছিয়ে নিয়ে রওনা দিত তার নিজস্ব অস্থায়ী সংসারে। আর আমার কাছে সেটা দুঃখের সাথে বেশ লোভনীয়ও ছিল। কারণ মামার বাড়ি হোক বা ঠাকুমার বাড়ি, ফেরার সময় হলেই, ব্যাগ ভর্তি হতে শুরু করত নানা খাবারে, মোয়া, নাড়ু, নিমকি, গজা, চাল ভাজা, নানারকম ফল, মিষ্টি, মুড়কি, বড়ি, কিছু সময় হরেকরকম সবজিতেও। মামার বাড়িতে আমার দুই মামী খুব যত্ন নিয়ে মা কে ব্যাগে ভোরে দিত। আর ঠাকুমার বাড়িতে ঠাকুমা নিজেই। সেই ভর্তি ব্যাগ নিয়ে যখন রাস্তায় নামতাম, দিদা মুখে কাপড় চাপা দিত, যাতে কেউ কান্না দেখতে না পাই, আর আমার দুই মামী রাস্তার মোড় অবধি এসে দাঁড়াত, যতক্ষণ না আমরা মোড়ের বাঁক ঘুরে আড়াল না হই। একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটত ঠাকুমার বাড়ি থেকে ফেরার সময়েও। মানুষটা, বাস চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে না যাওয়া অবধি দাঁড়িয়ে থাকত, চোখে জল নিয়ে। আর আমরা ঝাপসা চোখে এগোতাম গন্তব্যের দিকে।

আজও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে আমাদের জীবনে। বাড়ি আসার আনন্দে মশগুল আমরা, আসার দিন ঠিক হওয়ার পর থেকে হিসেবে বসি, কি কি যাবে, কি কি নেব, কবে থেকে প্যাকিং শুরু করব, সে এক অন্য আনন্দ। যত দিন এগিয়ে আসে, তত উত্তেজনা। যাব, যাচ্ছি এই দিন গোনার মজা অন্যরকম। আর তারপর আসে সেই প্রতীক্ষিত দিন, বাড়ি ফেরার দিন।

আমার বাবা বলত আমাদের সবাইকে একটা সময়, নিজের শিকড়ে ফিরতে হয়, নিজেকে জানার জন্য, নিজের অস্তিত্বকে বোঝার জন্য। বড় সত্যি সে কথা, পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, নিজের শহর, নিজের বাড়ি ফিরলে, আমরা বুঝি এটাই আমাদের পরিচয়, এখানেই আমাদের অস্তিত্ব। আজ নিজে বাইরে গিয়ে বুঝি, বাড়ি ফেরার টান কি। যে টান একসময় মা-বাবা বুঝত, আজ আমরা উপলব্ধি করি, নিজেদের দিয়ে। কোথাও যেন সময় থমকে দাঁড়ায়, আজও একই ভাবে আমার মা, শাশুড়ি মা, ফেরার সময় নানা জিনিস নেওয়ার জন্য তদ্বির করতে থাকে। না, ব্যাগে তারা ভরে দিতে পারে না নিজেদের মত পছন্দের জিনিস। কারণ দুই দেশের ভৌগোলিক পার্থক্য সে ভালোবাসা বোঝেনা, দেশের সীমানার বেড়াজালে আটকে যায় মমতা।

আবার আসে আমার বাড়ি ফেরার পালা, এবার আমার অস্থায়ী, ভ্রাম্যমান সংসারে ফেরার সময় আসে এগিয়ে। সংসারী আমি, আমার সেই বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগে ফর্দ করতে বসি, কি কি পাওয়া যায়না ওখানে, কি কি নিয়ে যেতে হবে এবার। মা, শাশুড়ি-মা-এর মত, স্মৃতির সরনী বেয়ে, আমার ফর্দ ভরে উঠতে থাকে

ক্রমতালিকায় .. এবার একটা সুন্দর বেডকভার লাগবে, ওখানে মোটেই ভালো পাওয়া যায়না, একটা সরস্বতী ঠাকুরের মূর্তি, ছেলের জন্য দুটো নরম বারমুডা, গরমে পরার জন্য কিছু ভালো শাড়ি .. ইত্যাদি ইত্যাদি।

শহর যখন সেজে উঠবে পুজোর আনন্দে, পুজোয় মাতবে আপামর মানুষজন, তখন গলার কাছে পাকিয়ে ওঠা কান্নাটা গিলে নিয়ে, আমি উড়ে যাব অন্য কোনো বাড়ি ফেরার টানে, যেখানে আমার তৈরী ফর্দের ক্রমান্বয় সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে, বাড়তেই থাকবে। আর পেছনে ধীরে ধীরে ঝাপসা হতে থাকবে আমার প্রাণের শহর, ভালোবাসার শহর, আমার জীবনের প্রিয় মানুষগুলোর মুখগুলো। আমায় বাড়ি ফিরতে হবে যে। অস্থায়ী নীড় হলেও।

*****

কৌতুক

একটি ছোট্ট মেয়ে তার শিক্ষিকার সাথে তিমি মাছ নিয়ে কথা বলছিল। শিক্ষিকা বললেন 'তিমি মাছ মানুষ খেতে পারে না, কারণ বিশাল বড় প্রাণী হলেও তার গলা খুব ছোট'। মেয়েটি বলল 'জোনাকে তিমি মাছ খেয়ে ফেলেছে'। শিক্ষিকা আবার বললেন যে তা অসম্ভব। মেয়েটি বলল 'আমি যখন স্বর্গে যাব, জোনাকে জিজ্ঞেস করব'। শিক্ষিকা বললেন 'আর যদি জোনা স্বর্গে না গিয়ে নরকে যায়'? মেয়েটি উত্তর দিল 'তাহলে তুমি জিজ্ঞেস কোরো'।

একজন শিক্ষক রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে তাঁর প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। ব্যাপারটা পরিস্কার করে বোঝানোর জন্য তিনি বললেন 'আমি যদি পা শূন্যে তুলে মাথা নীচে দিয়ে দাঁড়াই তাহলে সব রক্ত আমার মাথায় চলে যাবে, আমার মুখ লাল হয়ে যাবে'। ছেলেমেয়েরা বলল 'ঠিক'। 'তাহলে আমি যখন মাথা ওপরে দিয়ে পায়ের ওপরে ভর করে দাঁড়াই তখন আমার সব রক্ত পায়ে চলে যায় না কেন'? উত্তর এল 'কারণ তোমার পায়ের ভিতরটা খালি নয়'।

উচ্ছে

অরুণ শংকর রায়

হাম্বাগড়ের বদ্যি বলেন
রাজসভাতে বসে,
হাজার বছর বাঁচবে সবাই
উচ্ছে খেলে কষে।
হাতের ব্যথা, দাঁতের ব্যথা
বাতের ব্যথায় ক্লান্ত,
পঁচিশ কিলো উচ্ছে খেলেই
ব্যথারা সব শান্ত।
ঘুমের ঘোরে নাক-কানেরা
করতে থাকে শব্দ ?
উচ্ছে পোড়া বাইশ কিলো
খেলেই হবে জব্দ।

উচ্ছে দিয়ে পোলাও বানাও
উচ্ছে দিয়ে কোর্মা,
উচ্ছে দিয়ে নিমকি বানাও
বানাও খাস্তা খোর্মা।
উচ্ছে দিয়ে কালিয়া বানাও
উচ্ছে দিয়ে কাবাব,
উচ্ছে দিয়ে বানাও গজা
থাকবে না যার জবাব।

উচ্ছে দিয়ে পায়েস বানাও
উচ্ছে দিয়ে মণ্ডা,
উচ্ছে দিয়ে লাড্ডু বানাও,
বানাও হাজার গণ্ডা।
উচ্ছে দিয়ে রসোমালাই
উচ্ছে দিয়ে পিঠে,
উচ্ছে দিয়ে বানাও পুলি
চিনির চেয়ে মিঠে।
হাজার বছর বাঁচবে সবাই
উচ্ছে খেলে সত্যি,
বলছি আমি, রাজামশাই
মিথ্যে নয় এক রত্তি।

তত্ত্ব শুনে হুকুম দিলেন
হাম্বাগড়ের রাজা,
ক্ষেতখামারে উচ্ছে লাগাও
নইলে বিরাট সাজা,
উচ্ছে খাবে সারা জীবন
উচ্ছে খাবে তাজা,
ঢাক পিটিয়ে হুকুম দিলেন
হাম্বাগড়ের রাজা।

The Birthday Party

Arun Shankar Roy

All the animals came running
under the banyan tree,
Little elephant has a birthday party
what a fun to see!
The birthday girl got the best dress
that money can buy,
She wears a birthday hat
six and half feet high.

The donkey brought his drum
and the monkey his 'dhol',
All the animals held their hands
and started rock-and-roll.

The little girl blew the candles
and a birthday wish she made---
She wants to be a Hollywood actress
The little elephant proudly said.

Pig –The Big Chef

Arun Shankar Roy

The pig is a big chef,
He took lessons in Rome.
Graduating from the cooking school,
He made England his home.
His lamb chop is famous
And famous is his curry.
If you do not believe me---
Come here in a hurry.
Come one and come all
To his restaurant store.
Once you taste his Chinese noodle
Sure you would ask for more.

Alligator Stew

Arun Shankar Roy

In Ireland there was a king of forty-two,

All his life he ate only alligator stew.

He ate it at breakfast and all day long,

That kept the king healthy and strong.

One day the alligators of the world became so upset

They came to the palace gate to loudly protest.

Thousands of alligators loudly began to roar---

You will not eat alligators any more.

The king got scared and did not know what to do,

He promised he will never again eat alligator stew.

Dancer Painting By Dipak Roy

ছাড়ের ছায়ায় দুনিয়া ভ্রমণ

গৌর শীল

বয়স্ক বা প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিশেষ কিছু সুবিধা বা ছাড়ের ব্যবস্থা এখন অনেক ক্ষেত্রেই চালু হয়েছে। সরকারী, আধা-সরকারী, কী বেসরকারী যাই হোক না কেন, একটু মন দিয়ে খুঁজলে এই বিশেষ ছাড়ের অনেক দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে। তবে মনে রাখা দরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব ছাড় লুকিয়ে রাখা থাকে আড়ালে-আবডালে, অর্ধসত্য কিছু বাকচাতুরী বা অমায়িক ভণ্ডামির পেছনে, যা শক্ত হাতে মোকাবেলা না করলে সুবিধেগুলো আবিষ্কার করা কঠিন।

প্রথমে একটু ভেবে দেখা যেতে পারে প্রবীণ নাগরিকদের জন্যে কিছু বিশেষ সুবিধা বরাদ্দ করার পিছনে মূল সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোটা কি ধরনের। যেহেতু প্রবীণদলের অধিকাংশই তাঁদের রোজগারী কর্মজীবন শেষে এখন অবসরকাল কাটাচ্ছেন, অতএব সঞ্চয় করা অর্থের অপেক্ষাকৃত অল্প আয়ই তাঁদের জীবনধারণের প্রধান ভরসা। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই ঐ স্বল্প আয় জীবনযাপনের স্বাভাবিক মান রাখতে যথেষ্ট হয় না। একদিকে অবিরত মূল্যবৃদ্ধি ও অন্যদিকে ক্রমশঃ কমে যাওয়া সঞ্চয়ভাণ্ডার সাঁড়াশীর মতো তাঁদের কণ্ঠরোধ করতে এগিয়ে আসে।

বর্ষীয়ান নাগরিকদের মদত দিতে ১৯৩৫ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি Franklin Roosevelt আনলেন Social Securiy Act। Roosevelt চালু করলেন বিশেষ একটি ভাতা যাতে উপকৃত হবেন আমেরিকার প্রবীন নাগরিকেরা। এই ধরণের 'প্রবীণ-ভাতা' ইউরোপ-আমেরিকার অন্যান্য দেশে তার আগেই চালু হয়েছে। যেমন কানাডাতে Old Age Security Pension দেওয়া শুরু হয়েছে ১৯২৭-এ।

এরপর কয়েকটা Bankএর সৌজন্যে প্রবীন গ্রাহকদের bank-fee আংশিকভাবে মকুব হোল। বলা যেতে পারে এই আংশিক মকুবই বর্তমান প্রবীনদের জন্য বিশেষ ছাড় বা Seniors Discount-এর পথিকৃৎ। এর সহায়তা পেয়েই বয়স্কদের এই ছাড়ের ব্যাপারটা ডালপালা মেলে এগোতে থাকে। অনেক হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিনেমা. থিয়েটার প্রতিষ্ঠান কিছু আর্থিক সুবিধা বরাদ্দ করে প্রবীণদের জন্যে। পরিবহনের ক্ষেত্রে ট্রেনে ও বাসেও Seniors' discount পাওয়া যায়। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে বিমান বিভাগে এই Discount অপেক্ষাকৃত বিরল।

কিছুদিন আগে আমরা একটা River Cruise-এ গিয়ে কয়েকটা দিন ইয়োরোপের Rhine নদীর ওপরে কাটিয়েছিলাম। এই Cruise Company তাদের দামের মধ্যে প্রবীণ যাত্রীদের জন্যে কোনও বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রাখেনি। এতে অবশ্য খুব অবাক হওয়ার মত কিছু নেই। বড় বড় জাহাজ কোম্পানীরা কখনো কখনো স্পেশাল কিছু ছাড় দেয় বটে (Teachers' discount, Ontario discount, Singles' discount ইত্যাদি) কিন্তু নিয়মমাফিক কিছু নেই Seniors' discount বলে। আমরা Amsterdam থেকে জলযানে উঠে সুইজারল্যান্ডের Basel অবধি গেলাম। তারপর ট্রেনে চেপে ইয়োরোপের তিনটে শহর সফর করা দিন দশেকের পরিকল্পনা।

ট্রেন সফর ইয়োরোপে খুব কিছু জটিল নয় এমনিতে। তবে আগে থেকে অনেক বেশী planning করতে হয় বিমান সফরের তুলনায়। আমরা একটা Eurail Pass কিনেছিলাম, তার ফলে ইচ্ছে মত যে কোনও ট্রেন ধরে কয়েক দিন যে কোনো শহরে যাওয়া চলবে। এই Pass কিনতে Seniors' discount পাওয়া গেল শতকরা দশ ভাগ (10%)। Canada থেকে Europe যাওয়ার টিকেটে Air Canada কোনও Discount দিয়েছে কিনা জানা যায় নি কারণ Cruise-এর মধ্যেই ওটা একসঙ্গে ধরা ছিলো। Internet-এ Dr. Google-এর মাধ্যমে জানা যায় যে Air Canada এমনিতে 10% ছাড় দেয় aenior-দের। কিন্তু এখানে একটা প্যাঁচ থাকতে পারে। অর্থাৎ ঐ ছাড় পাওয়া যাবে শুধু মাত্র regular ভাড়া দিয়ে বেশী দামের টিকিট কাটলে, নতুবা নয়। অমায়িক ভন্ডামি!

আমাদের cruise শেষ হয়েছিল Basel শহরে -- সেখান থেকে ট্রেন সফরের শুরু। Rail Pass থাকা সত্ত্বেও আমরা seats রিজার্ভ করেছিলাম extra fee দিয়ে (sorry, no discount), নইলে দাঁড়িয়ে যাবার risk থাকে। মাঝে Frankfurt আর Dresden-এ গাড়ি বদলে বিকেলবেলা Czechoslovakia-র রাজধানী Prague-এ পৌঁছালো ট্রেনটা। স্টেশন থেকে হোটেলে যেতে taxi ধরতে হবে। এখানকার ট্যাক্সি ওয়ালাদের বদনাম আছে বেশী দাম হাঁকার (সত্যি প্রমাণ হয়েছে আমাদের বেলাতেও)। মিটারে কেউ যায় না, দরাদরি করে দাম ঠিক করতে হয়। ঐ দরাদরির মধ্যে aeniors' discount-এর কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম, যদিও তাতে কিছু তফাৎ হোত না বলেই আমার বিশ্বাস।

পরেরদিন সকালে breakfast সেরে আমরা বেরোলাম বিশেষ দর্শনীয় জায়গাগুলোর কয়েকটা দেখতে – যেমন Boat cruise, Astronomical Clock, Charles Bridge ইত্যাদি। একটা guided tour book করা হোলো আগামী কালের জন্য। প্রথমে গেলাম কাছাকাছি metro স্টেশনে। ভেতরে ঢুকে কোনও টিকিট কাউন্টার দেখা গেল না। কিন্তু অনেক machine রয়েছে এবং লোকেরা ইচ্ছে মত টিকিট কাটছে। আমরা একটা machine-এর কাছে গিয়ে প্রথমে তার ভাষাটা বদলে ইংরেজী করে নিলাম। তারপর Credit Card দিয়ে দুটো 24-hour টিকিট কিনে ফেললাম। ব্যাপারটা বেশ সহজেই হয়ে গেল।

এবার আমরা যাবো Vitava নদীতে aightseeing cruise boat ধরতে। Metro-র মধ্যে এই সময় দুজন aecurity guard দেখে আমি একজনের কাছে জানতে চাইলাম আমাদের টিকিটগুলো কালও valid থাকবে কিনা। সে টিকিটের ওপরে time stamp-টা দেখিয়ে বলল আগামীকাল সকাল এগারোটা অবধি ওটা valid থাকবে। তারপর কি ভেবে আমাদের ID দেখতে চাইলো। আমাদের সঙ্গে Passport ছিলো – সেটা দেখালাম। আসলে সে আমাদের বয়স কত দেখতে চাইছিল। কেননা আমার বয়স 75+ হওয়াতে টিকিট পুরো ফ্রী, আর madam-এর হাফ-ফ্রী! শুনে আমাদের 'হরিষে বিষাদ' অবস্থা। টিকিট refund করার অনেক ঝামেলা, তাই সামান্য ক্ষতি মেনে নিয়ে আমরা metro-তে উঠে বসলাম।

Prague-এ আমরা আরও দুদিন ছিলাম। বিভিন্ন দর্শনীয় জিনিষের তালিকায় যোগ হয়েছিল একটি শ্রুতিনন্দন অভিজ্ঞতা। Prague Municipal Theatre Hall-এ আমরা একটা Musical Concert শুনতে গেছিলাম দ্বিতীয়

দিন সন্ধ্যায়। এর টিকিট খুব সুলভ ছিল না বটে, তবে আমাদের বয়স বিচার করে 30% কমিশন বা ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়। কখনো জয়, কখনো নয়।

কখনো লাভ., কখনো ক্ষতির আর এক অঘটন এই free metro-চড়া নিয়েই ঘটেছিল কয়েকদিন বাদেই। আমরা Prague থেকে তখন হাঙ্গেরীর Budapest-এ এসেছি। সাবধানের মার নেই – এই ভেবে প্রথমেই Internet-এ Budapest-এর metro-তে Seniors' discount কিরকম খোঁজ করা হোলো। জানা গেল 62+ যাত্রীদের ট্রাম-বাস-মেট্রোতে কোনও টিকিট লাগে না। ব্যস, আর চিন্তা কী। আমরা দুদিন ধরে যথেচ্ছ metro ধরে ঘুরে বেড়ালাম। মাঝে দুজন যাত্রী আর একজন মেট্রোর কর্মীকেও জিগ্যেস করলাম আমরা কোন ভুল করছি না তো? তারা বলল সব ঠিক আছে, সিনিয়রদের public transportation free।

কিন্তু বেলুন ফাঁসলো পরের দিন। আমরা সকালে breakfast শেষ করেছিলাম একটু দেরীতে। তার পরে আমাদের Hop-On-Hoff-Off বাসের টিকিট নিয়ে (sorry, no seniors' discount !) bus-stop-এ অপেক্ষা করছিলাম একটা walking tour-এ যোগ দিতে। ট্যুর চলে বেলা ১১-টা থেকে ১-টা অবধি। তখন আমরা একটা Pizzeria-তে ঢুকে lunch শেষ করি। তারপর HOHO Bus-এ উঠে কিছুটা শহর-পরিক্রমা করে হোটেলে ফেরার পালা। সেই উদ্দেশে একটা metro স্টেশনে ঢুকে আমরা platform-এর দিকে হাঁটা দিই। এমনিতে কোনও checking করার কেউ থাকে না, কিন্তু সেদিন দুজন টিকিট-চেকার আমাদের challenge করে এবং টিকিট দেখাতে বলে। আমাদের কথোপকথন ছিল এইরকম:

TC: Your ticket, sir? We have to check your ticket.

ME: What ticket? We are senior citizens and senior citizens ride free here.

TC. Yes sir, senior citizens ride free. But only from EU countries.

ME: Do you know we are Canadians? We were in Prague and allowed to ride free.

TC: Canada is not part of EU. You have to get a ticket.

অগত্যা, আমরা টিকিট কাটতে গেলাম হতাশ হয়ে। একটা machine-এ দুজন ভারতীয় তরুণ এয়ারপোর্টে যাবার টিকিট কাটছিলো – তারা তাদের দুটো day-pass আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল - ওদের আর দরকার নেই ঐ pass-এর। অতএব এবারও আমরা free ride পেলাম।

বিশাল ভুবন সামনে দেখে দ্বিধার ভয়ে হারব না,

হোঁচট খেলেও লড়ব তবু ছাড়ের লাঠি ছাড়ব না।

এপার - ওপার

নন্দিতা রায়

বৈতরণীর পারে বসে আছি, হাতে কড়ি নিয়ে। এ আমার পারাপারের পারানি। কোন একদিন ‘গান গেয়ে তরি বেয়ে’ আসবে মাঝি। তার হাতে তুলে দেব পারের কড়ি। সে আমাকে নিয়ে যাবে দূরে, বহু দূরে কোন এক অচেনা দেশে। এ যাত্রায় সঙ্গী নেই, সাথী নেই, শুধু আমি একা। বেশ রহস্যময়, কিছুটা রোমাঞ্চ জাগানো এ যাত্রা। এ আমার শেষ যাত্রা।

পেছনে যে পৃথিবীকে ফেলে যাচ্ছি তার জন্যে, তার মানুষদের জন্যে কিছুটা দরদ, কিছুটা বিচ্ছেদের ব্যথা যে অনুভব করছি না তা নয়। তাই ভাবছি মনুষ্যোত্তর জীবনে যখন পরমপাদ দেবদেবীদের সঙ্গে দেখা হবে তখন তাঁদের কাছে এদের জন্যে একটা আবেদন পত্র পেশ করবো।

আমার লেখা শুরু হবে স্বর্গধামের নন্দনকাননে, পারিজাত ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে। ক্ষিধে পেলে এক বাটি অমৃত খেয়ে নেবো, তাতে কল্পনাশক্তি খুব জোরালো হবে। এই আমার আশা। কিন্তু থাক। ওপারে গিয়ে এপারের সব কথা, সব সুখ দুঃখ হয়তো মনে নাও পড়তে পারে। তাই, ‘হাতে পাঁজি মঙ্গলবার’ এখনিই লেখাটা সুরু করে দিই, পৃথিবীর গন্ধ গায়ে থাকতে থাকতে।

স্বর্গেই যে যাবো তারও তো কোন ঠিক নেই। তার উল্টোটাতেও তো গতি হতে পারে। তখন সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে আমার কাগজের ভস্মাবস্থা দেখতে হবে। আগে আগে লিখে দেবদূতের হাতে পাঠিয়ে দিই। তারপরে আগুনেই পুড়ি আর অমৃতই খাই আমার দরখাস্ত ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে।

আমার দরখাস্তের মূল বক্তব্য হবে এই যে স্বর্গের নিয়মে এখন একটা পরিবর্তন আসা দরকার। মর্ত্যের মানুষদের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য রেখে। স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা হলো ত্রিশক্তির শাসন। ওপরে প্রপিতামহ ব্রহ্মা। তাঁর পাশে রয়েছেন শিব এবং বিষ্ণু। এঁদের সঙ্গে রয়েছেন অসংখ্য দেবদেবী। এঁরা প্রত্যেকে মানুষের কোন না কোন প্রয়োজনের সাথী। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেব এক সময়ে মানুষ ছিলেন। একশটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তাঁর পূর্বতন ইন্দ্ররাজকে সরিয়ে ইন্দ্র পদে কায়েম হয়ে বসে আছেন কোন না জানা যুগ থেকে। রাজা, মন্ত্রী, পারিষদ ইত্যাদি নিয়ে স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা। নীচের মানুষদের কর্ম, ধর্ম, চরিত্র, ভালো, মন্দ – সব কিছু তাঁদের নখ দর্পণে। কাল সদা জাগ্রত প্রহরী। মানুষের এতটুকু ত্রুটী হলে তা সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে যায় চিত্রগুপ্তের খাতায়। তারপর সারা জীবনের সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, অসুখ, অশান্তির পরে কর্ম অনুযায়ী পরজীবন তৈরী হয়। একেবারে ‘ফ্যাক্টরি সিস্টেম’।

কিন্তু যাঁরা আমাদের এতটা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁদের বিচারে কি কোন ফাঁক নেই? তাঁদেরও কি ভুল হয় না? আমরা মর্ত্যবাসীরা অনেক সময় অনুভব করি ভগবান আমাদের ওপর সুবিচার করেননি। তার কারণ আমরা যে আন্দাজ করতে পারি না তা নয়। কোথায় একটা ‘কমিুনিকেশন ব্রেকডাউন’ হয়ে আছে। তাতে কর্মফল ঠিক ঠিক ফল দিতে পারে না। মনে হয়, বোঝাপড়া আর দেখাশোনার অভাবে এটা হয়েছে।

ধরা যাক, সংখ্যার কথা। আগে তেত্রিশ কোটি লোকের জন্য তেত্রিশ কোটি দেবদেবী ছিলেন। এখন ভারতে সনাতনীরা (সিন্ধুনদ এখন পাকিস্তানে তাই হিন্দু লিখলাম না) সংখ্যায় আধ বিলিয়ন হয়ে গেছেন, অথচ সে অনুপাতে দেবদেবীদের সংখ্যা বাড়েনি। ফলে মাথাপিছু পর্যবেক্ষণের হার খুবই সামান্য। এ ছাড়া 'পোর্টফোলিওর'ও একটা সমস্যা রয়েছে। ধন্বন্তরি ডাক্তার আগে জল, অগ্নি, বিষ, সর্প, ক্ষুৎ, ব্যাধি, আর পাহাড় থেকে পতনের চিকিৎসা করতেন। এইড, এভিয়ান ফ্লু, কোভিড ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা করতেন না। সেখানেও একজন দেবতার দরকার। পবনদেব 'হারিকেন', 'সাইক্লোন', 'টর্নেডো' রূপে বারবার হানা দিচ্ছেন। বরুণদেব তথা 'পসিডন' কখনো একা, কখনো পবনদেবের সাথে হাত মিলিয়ে 'সুনামি'র তান্ডব নৃত্য করছেন। অথচ, তাঁদের তুষ্টির কোন ব্যবস্থা স্বর্গ থেকে আসছে না। এঁরা আর্য দেব। এঁদের মূর্তি নাই। তাই পায়ে অঞ্জলি দিয়ে যে একটা ব্যবস্থা হবে, তারও উপায় নেই। অগ্নিদেব এখন বিস্ফোরণের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন, তাই অরণ্য পুড়িয়ে তাঁর যে অল্পব্যাধি সারবে, তার কোন সম্ভাবনাই নেই। তাঁকে সাহায্য করার জন্যেও তো একজন দেবতার দরকার।

মা সরস্বতী বীণা হাতে নিয়ে বসে আছেন, অথচ ভক্তরা হারমোনিয়াম বাজিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে। মা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে এখনও কড়ি বাঁধা, ভেতরে সোনাদানা। এদিকে 'গোল্ড ষ্ট্যানডার্ড' সরিয়ে, ডলার সাম্রাজ্য পেতেছে। ইউরোডলার আর ইয়েনের তো কথাই নেই। তাই শেয়ার মার্কেটের ওঠা নামায় তাল রাখতে হিমশিম দশা। গণেশদাদা অবশ্য ঠিক জায়গাতেই বসে আছেন। কিন্তু কার্ত্তিক ঠাকুর তীর ধনুক দিয়ে কী করে 'নিউক্লিয়ার ওয়েপন' ঠেকাবেন তাই ভাবছি।

প্রজাপতি ব্রহ্মা ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেন। প্রজার সৃষ্টিতে সাহায্য করেন। এখন সম-লিঙ্গ ব্যক্তিরা বিবাহ করছেন। তাই প্রজাপতির নাম দিয়ে চিঠি ছাপানো বাতুলতা। মনে হয় এ ধরণের বিয়ে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যেও একজন দেব/দেবীর দরকার।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়েছে আমাদের ভাষা নিয়ে। সংস্কৃত দেবভাষা। দেবতারা তাই বোঝেন। অথচ সনাতনীদের এক ক্ষীণাংশ মাত্র এখন সেই ভাষা শেখে। এখন দেশে রাজা নেই, রাজপুরোহিতও নেই। তাই তাঁরা যে প্রজার হয়ে মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে একটা মোকাবিলা করবেন, তারও উপায় নেই। এখনকার পণ্ডিতেরা সবাই কোন না কোন 'প্রফেশনে' ব্যস্ত – তাই পুরোহিত দর্পণের বাইরে তাঁরা যেতে সাহস করেন না। এখানে একজন স্বর্গের প্রতিনিধি দরকার যিনি 'লিঙ্গুআ ফ্রাঙ্কা' বুঝবেন।

দেবতাদের কাছে আর একটা প্রয়োজনের কথা জানাবো। সেটা হচ্ছে স্বর্গে কম্পিউটার চালু করা। একটা ই-মেল এর ঠিকানা দিলে আমরা সরাসরি তাঁদের কাছে মানুষের বার্তা জানাতে পারবো।

আমার শেষ অনুরোধ হবে ষষ্ঠি ঠাকরুণকে জানানো যে উনি বেড়াল-প্রেমিকদের তাদের বেড়ালদের 'ডায়াপার' পরানোর নির্দেশ দিতে পারবেন কিনা। তাঁর বাহনদের জ্বালায় মানুষেরা যে আর বাগানে বসতে পারছে না!

পার্বতী-পরমেশ্বরের চরণে মাথা ঠেকিয়ে আমার বক্তব্য জানিয়ে রাখলাম।

My Five Mothers

Nirmal K. Sinha

Soon after getting off the fastest train of India then, "Kalka Mail", at Delhi's central railway station in Old Delhi, I noticed an area behind steel bars surrounding a big cage-like room on the platform. This caged room was very close to the compartment we travelled from Calcutta (Kolkata), but closer to the car carrying mails. There were knee-high stone barriers around this enslaved area except for the opening toward the train. This constricted area was marked as 'mail'. A number of coolies in red shirts and arm bands with shiny brass tags showing their registered numbers, were going in and out of this room unloading their cargos from their heads. Soon the open door facing the train side closed and the inner cage started slowly to move downwards to some dark underground space. Within a minute or so the cage came up empty and the door opened to the waiting coolies to rush in. It was a very hot and extremely dry night of July 1950 and I was mesmerized by this wonderful moving room, never seen before in my life of 8 years, and wondering about the boxes and large jute bags containing the mails and other things.

I stood with my small bag containing two genjis (under-shirts), two shirts, two half pants, two pairs of cotton socks and my medicines, hanging from my right shoulder. The large stone blocks were also the subjects of my curiosity because rocks were absent in the world's largest delta land, Bengal of alluvial soil). Most of Bengal (of undivided India) other than the foothills of the Himalaya and parts of western and eastern sectors of the province is flat. Naturally, I did not see any rocks other than the pathhorer (of marble) bowls, glasses and plates in our Lakshmi ghar (Puja room) which also was my Kartama's or paternal grandmother's bedroom, and the hobisshsi ghar (vegetarian kitchen) where Kartama used to cook vegetarian dishes, of course, assisted by my elder sisters. Each of these two rooms with their corrugated tin roofs was free standing. A room full, floor to ceiling, of split logs (used for cooking) was attached to the

main kitchen with inside eating and cooking areas on the floor and a veranda with a longer eating area. There were no tables or chairs in these rooms. We used to sit on rectangular, polished and varnished wooden seats (pinris) or ashons (small mats) on the floor. Ma (Urmila) and Kakima (Prova Bati), who was essentially the second mother to me, used to serve us food. They were very strong and often used to carry split logs and stack them nicely inside the kitchen adjacent to the two wood or coal stoves made with unfired clay. Like Ma and Kakima my paternal grandma or Kartama (Sharoda Devi) was also very strong. Kartama actually taught me to swim in the north-south flowing Little-Jamuna River behind our house.

Anyway, I started to examine the roughened rock surfaces of the stone railing. Suddenly a soft touch on my left shoulder woke me up. I turned around and looked up. There was a smiling face of a tall and slim woman in a simple khaddar sari (made from handspun cotton thread). I recognized her sari material because Baba also used to wear Khadi dhooti and punjabi. I kept staring at her, speechless. She said nothing but kept looking at me with a smile in her face. Was this person my Pishima (paternal Aunt) I was supposed to live with in Delhi? I keep thinking but couldn't ask anything. The lady broke the silence and said, "Lift", pointing a finger towards the up and down moving cage. She continued, "It is also called an elevator". Both of these two terms were new to me. However, I liked the longer name; it sounded nicer. She then explained the mystery of the cage and asked me if I was interested to see the engine of the train. I guess I nodded positively without saying anything. The mystery of the identity of the lady occupied my mind fully.

The train's engine was not too far from where we were standing. It was in front of several cargo compartments, including the one marked as 'mail', and the third-class compartment, marked as "III class", in which we travelled from Howrah Station in Calcutta. The steam-engine was a huge and long monster puffing out steam on the sides out of the chambers close to the tracks. This engine was significantly larger than the ones I used to see at our railway station, Shantahar Junction. While still holding my left arm, the mystery lady said, "It's a Canadian

engine and made in Canada for long haul and high speed." Canada was nonexistent in my vocabulary although I knew the Americas, I mean the name.

Several years earlier, while the 2nd World War was still going on, my closest friend Nitu introduced me to the strange land of America. He was very knowledgeable (I used to think) and taught me that the American soil was so rich that it changes the colour of the skin if one's face comes in contact with it. "That's why", Nitu explained why the American soldiers staying in an encampment by the river, north of the 'Bharcharger Jangol (Bhattacharya-Jungle) adjacent to our properties and not far from our house, had reddish faces.

The red-face soldiers used to go back and forth on the Ukilpara road (Ukil means lawyer) beside the western edge of our property spanning an area of six bighas between the road and the Little Jamuna River. Both Nitu and I often used to get joy-rides in their jeeps. Even today I remember that they used to share tiny blocks of chocolate with us.

The surrounding area of the Canadian engine of the Kalka Mail was extremely hot with steam leaking on the side. There were several engine operators, with dirty blue bandanas covering their heads, either standing by the engine or doing something on the sides of the engine. The appearance of their faces somehow looked different to me. My lady, while holding my left hand, started to talk with one of these men. I couldn't understand what they were talking about. Suddenly one of them smiled at me and picked me up and climbed up the stairs to the engine room. He was very soft- spoken and showed or tried to explain, in mixed Hindi and English, all sorts of wheels and dial-gauges of the engine. I could not really understand his language. He showed me the port through which they throw shovels of coal, but he didn't open that because it was extremely hot and not safe (for me, I guessed). As we were coming back towards our compartment, the lady in khadi sari clarified my curiosity by saying that the engine drivers were Anglo-Indians.

During the previous day and night, for about 26 hours, I was trapped inside one of the III-Class compartments of Kalka Mail. The moment I saw the name Kalka at the Howrah station, it reminded me of my only paternal uncle, Kaka (Jitendra Mohon Sinha) and Kakima. Kakima was the second mother to me. I am told

that I used to drink her breast milk too. Kaka and Kakima had only one child. Along with eleven children of my parents, we completed a team of dozen offspring in our joint family. As a child, I used to spend more time with Kakima than my own mother. Incidentally, Ma and Kakima were related – actually cousins to each other. I strongly believe that Ma and Kakima, and perhaps Kartama too, inspired Barda and Sejda to stand up for basic human rights.

I travelled from Howrah to Delhi with a large lady I met for the first time in Howrah station of Calcutta (Kolkata). She was introduced to me as 'Gupta Pishima' by Barda, my eldest brother. Gupta Pishima or Miss Sohini Gupta, I came to know later, was a student of Madam Montessori and was in charge of the Montessori section of the Vidya Bhavan school in Karol Bagh of New Delhi. Anyway, Barda and Ma brought me to Howrah. Actually, only a few days ago I was united with Ma for a brief period when she could manage to travel from Naogaon, simply to see-off me to a new life in Delhi. My father was not well and stayed in Naogaon. At present Naogaon is the district town of the Naogaon Zilla of Bangladesh.

A few days earlier Ma took the same Darjeeling Mail from Shantahar station to come to Sealdaha station of Calcutta, and I was pushed inside through a window along with my two-year older sister, Didi, to escape to India. It is very difficult to imagine how desperate our parents and family were to make sure we could go to a safe place. This incident occurred a few months after the day of horror – I wish I could pin down the date when three trains (Darjeeling Mail, Atrai Mail and Bogra Express) became the slaughter houses, somewhere in between the two railway stations: Shantahar and Natore, in East Pakistan. One by one, these three trains were stopped in the middle of open paddy fields on either sides of the railway track. Apparently, the insurgents from the province of Bihar of India determined to perform ethnic cleansing – rather religious purification, migrated to East Pakistan. They started the rampage in around 1949-50. Until then, the northern districts of East Pakistan were relatively calm and comparatively free from communal tension in comparison to the southern districts of the country. It was only after this train-massacre, Hindu residents of the areas of North

Bengal, that became parts of East Pakistan, started to escape in-mass and became refugees (with a fancy name of 'displaced persons') in India.

I was born in a Hindu family before India was divided into three parts: India and Two parts of Pakistan, East and West, and I became an "alien", when I was only five years of age in my own birth country simply because I was not circumcised and eventually treated officially as an 'orphan child refugee' in a camp near Barackpore inside free-India. I didn't know where my Didi was kept.

At this juncture, I should mention that the khadi-sari clad mystery lady I met at Delhi's railway station turned out to be my BHU-UK educated 'Pishima'- Miss Sudhangshu Bala Sanyal. Nobody actually told me this, though. I just figured out this by inferences after enjoying a horse-drawn Tanga ride with Gupta-Pishima, the mystery lady and Lachman Singh from Delhi station to my final destination in Karol Bagh. Eventually Pishima became my mother as well as my father. She was actually a well-known educator and founded the first Bengali-medium school for girls (Vidya Bhavan Girl's Higher-Secondary School) in New Delhi, the capital of British India, in the year of my birth, 1942 when girls did not need to be educated more than acquiring the skills of basic reading and writing. In those days, there were already two Bengali-medium high schools for boys - the first in Old Delhi (Bengali Boys) and the second in New Delhi, known as the Raisina school. In 1980, the All India Bengali Cultural Association recognized her outstanding contributions during its Diamond-Jubilee celebration at Kalibari, New Delhi and 53rd annual conference in Jamshedpur.

Let me trace back a page from India's history. As the capital of British India moved from Calcutta (Kolkata) to Delhi in 1911, thousands of Bengali 'Baboos', the pillars of British administrative forces were moved to Delhi. This led to the establishment of the first school (of course for boys) and later the second school in 1925 when Litton's New Delhi started to develop in the flat areas east of the hilly village of Raisina. The second Bengali-medium boy's school was named as 'Raisina Bengali ..."

Soon after the shift of the capital from Calcutta to Delhi in 1911, two medical doctors trained in western medicines, were also shifted to Delhi. One of these two doctors was my Pishima's father, Dr. Hem Chandra Sanyal**. He was

married to my Kartama's younger sister and had seven children – two sons and five daughters. Since there were no schools for Bengali girls in Delhi, Pishima and her sisters were sent to Benares (Varanasi) to attend proper Bengali-medium school. Eventually my aunt became a Sanskrit scholar (MA) from Benares Hindu University (BHU) and went to UK for higher education in English. My aunt inspired me to be a Citizen of the Earth and, in fact, I left India at the age 19 for higher education by earning my own passage money, etc. This provided me with the conviction that every child must receive the best of life, education and cultivation of fearlessness through the awakening, and the awareness that freedom was everyone's birthright.

I was once interrogated by the British-Indian police (actually they were all India-born) when they found three beautiful, red-coloured tubes with shiny brass ends in my collection box containing all kinds of my precious collectibles. I was perhaps four years old or certainly less than five years of age - that is, before the Independence Day of 15th August, 1947. I discovered those wonderful brass-ended tubes in the 'Bharcharger Jangol', north of our properties by the Little Jamuna. Even as a child, I was not social in my characteristics, probably because I suffered from some speech related issues. But I did know that those priceless pieces of my collection were from banduks used by some young persons like my Sejda or the third-oldest brother (Bireswar Sinha) who used to be the followers of Khudiram-type revolutionaries - and I did know that two of the banduks (guns) were hidden inside our kitchen under the pile of logs beside the cooking stove, and the custodians were Ma and Kakima. Sejda was already in the high-security British Jail. In those days, nobody, even the red-pagree police dared not go in any Barendra-brahmin's kitchen. Even the local musalmans were afraid to do that.

The beginning of my life was somehow kind of linked to a famous freedom fighter, Netaji or Subhas Chandra Bose, "the forgotten hero of India". When Netaji escaped from British surveillance in 1941 and headed for Afghanistan, I was under developments in Ma's womb and two of my elder brothers, the freedom fighters, Kedar Nath Sinha (Barda) and Bireswar Sinha (Sejda) were in British Indian jails due to their direct and active participations with the 'Congress and/or

Forward Block' (established by Netaji), and Revolutionary Socialist Party (RSP). I rarely saw these two Dadas, freely, until India became independent. In course of time both Barda and Sejda were recognized by the Central Government of India and the State Government of West Bengal, BUT, nothing can replace the days I lost as an "orphan refugee child" in a refugee camp within the country of my birth! What a price to pay for freedom! But then, what a price Netaji paid to fight for the freedom of India!

Going forward, in December 1963, I left the job of a high-school Physics teacher in Ottawa and moved to Oshawa after getting a position of a research scientist in the small glass and ceramics production research and development (R & D) laboratory of Duplate Canada Limited. I became the 15th person of the laboratory. It remained a mystery to me why the Bateson/Hunt team selected me for the job when I had absolutely no research experience and all I had was a B.Sc. (Physics honours) degree from Delhi University.

After moving to Oshawa, I stayed in a small hotel with a small restaurant with a TV and a large beer parlor in the first floor, and a few rooms on the second floor. This hotel was only about three minutes' walk from my place of work. The hotel offered me a room at a very reasonable, monthly charge. Actually I was the only person staying there and I ended up staying there for a little over two months. I got into the habit of watching the TV after finishing the meal in the restaurant before going upstairs to sleep. One such an evening on 16th February 1964, 'The Ed Sullivan show' broadcasted a live performance of the Beatles, a music band of UK. It was an extremely noisy program. I simply didn't like the show, but kept on watching, hoping to listen a bit of their songs without drowned by the noise because I was not aware of this music band. Next morning on my way to work I picked up a copy of the local newspaper, Oshawa Times, full with pictures of the screaming girls and boys infected with Beatles mania. On the same day at work, my technician George, asked me if I was interested to rent his mother's house. During the lunch break George took me to his late grandparent's house on 501 Cubert Street to introduce me to his mother Mrs. Clara Gudgeon and her sister, Miss Alberta Osborne. The kitchen table was full with four sets of table mats, plates and soup bowls as well as a huge plate in

the middle loaded with a mountain of egg-sandwiches. Obviously I enjoyed the lunch and chit-chat with the two ladies. Then George and I walked to 213 Hillside Avenue, only four houses away to show their house for rent. It was a single house with a garage, a long porch, a living-come bedroom with a powder room (toilet and a sink) and another relatively large room with a small stove, a refrigerator, a washer and a drier. The bathroom and two other rooms on the second floor and the stairs with a separate side-entrance were rented out to a young couple with a toddler. Thus, if wanted a bath, I could go to the Cubert street house. I agreed to rent the premises provided I could also have my meals at the other house. This arrangement lasted for almost six years until I got married and moved out of the Gudgeon-Osborne nest.

Mrs. Gudgeon became my Ma-Gudgeon and her sister became my Aunt-Bert who was still working at General Motors. Later I heard the remarkable story about the sacrifice Aunt Bert made by not getting married to provide full financial and other supports to her elder sister who suddenly became a widow when with two boys were only two and four years old. My first Christmas in1964 with the larger Gudgeon-Osborne extended family and their friends was remarkable. We gathered inside the St. Georges Anglican Church for the mid-night mass. It was a wonderful experience of music and prayer. Sitting at the end of the family-pew I followed the up and down motions of the devotees, but couldn't really sing the hymns beyond reading them. At the end of all the ceremonies, I followed everybody and very innocently took the communion at the altar guided by Reverend Bombay. Anyways, the wine was sweet, but only one sip was not satisfying.

When we came out of the church after attending the midnight ceremony, I found Ma-Gudgeon very upset, thinking of what would happen to me, what punishment would I receive from God! With tears of worry in her eyes, she told me that I was not a baptized Christian. What I did not know was that I was not supposed to take the communion.

It just happened that George was two years older than me and Grant was two years younger than me. Both of them got married and living separately and elsewhere with one daughter each – Shirly-Ann (two months) and Janine (four months). Since age-wise I was in the middle of the Gudgeon brothers, soon I became the third son to both Ma-Gudgeon and Aunt Bert and filled the space

in the empty nest. And Ma-Gudgeon was a great cook too. During the weekends, the two sisters used to prepare all kinds of dishes and I used to eat a lot. Collectively, the sisters removed the idea, instilled in my head from childhood in India, that the people in England don't know how to cook.

Janine used to spend the entire day with her grandma during the week days. She used to go home only to sleep. Every day, I used to see Janine during the breakfast, the lunch-hour and the evening dinner. I used to feed her and change the diapers too, on emergency. She really became my daughter. Thus practical fatherhood or child caring experience came early in my life. I often used to pick up freshly baked bread from the Mill-Street Bakery on my walking path to home. Janine used to love the soft and warm bread. The bakery used to be beside the Oshawa Creek and long time ago there used to be a water-driven mill to grind the wheat. Soon Janine was joined by a baby sister, Lynnette when Grant became the father again. Often we used to have baby Shirly Ann too. Consequently I started to see three daughters during the days. Perhaps this experience prepared me for the trinity of daughters in my married life.

Sometime during the year of 1967, Mr. Gulam Mohammed Parekh and his wife, Mariam came to Oshawa to live. Earlier they came to Toronto from a small town in the state of Gujrat in India to live with their only son and brought with them their son's teen-aged daughter and son out of his first marriage. Their son went to UK for higher learning and married an English girl following divorce from his former wife. According to the local customs, a divorced wife cannot live anymore with her parents-in-law. Consequently, Mr. and Mrs. Parekh became the guardians of their two grandchildren. Eventually their son migrated to Canada from UK and settled there with his second wife and two of their beautiful sons. Soon he decided to sponsor his parents and his two other children. The senior Parekhs sold everything in India and came to Toronto. Eventually Mr. Parekh wanted to start a new and independent life and obtained a job as a night-security guard in an auto-parts manufacturing factory in Oshawa and moved together with his wife. The couple soon came to know that they were not alone; there was another India-born person in Oshawa. One evening I received a call from them and found out that their flat was within walking distance from my place. Naturally I went there immediately. Seeing me at their front door, Mrs. Parekh stared at

me without uttering a single word. She then grabbed me, hugged me tightly and started to cry. Mr. Parekh was also in tears. I didn't quite understand what was going on in their minds, but never forget this touching moment in my life. They started to treat me as if I was their son. To cut the long story short, Mrs. Parekh became my 5th mother.

One evening, I visited the Parekhs when my Ma-Parekh was getting ready to start her evening prayer. She placed the praying mat on the floor and sat down with bent knees and facing towards the West. I could not resist myself and told her to change her position and turn her face towards East. She said in Gujrati, "Nirmal, you are a Hindu and pray the rising Sun in the East, but …". I told her that there are no differences between the Hindus and the Muslims in Canada. Both of us pray towards the East. Moreover, both of us shared the same ancestry, anyways. She didn't quite comprehend my remarks. Excusing myself I went to the washroom, took off my socks, washed my feet and hands and came out. Walking to the prayer mat on the floor I stood facing east and started to perform my prayer in Arabic, I learnt during my seven-week journey from Montreal to Bombay in a cargo boat with the Muslim crew from, mainly from Rajabazar in Kolkata. At the end of the short prayer, I requested her to wait for me until I come back and then rushed out. I ran to my place to get the globe I had and ran back to the Parekh residence and showed Ma-Parekh that Makkah in Saudi Arabia was indeed in the East from Oshawa.

** Many, many decades ago, "Desh Patrika" published an article on these two medical doctors. Pishima had a copy of the issue and I did read it as a child. Following the death of my Pishima in 1987, the entire collection of her books and papers were taken away by her admirers. It would be wonderful if somebody could unearth the name of the other doctor and let me know. Fortunately, I have a professionally taken photograph of these two doctors in my collection, but no names are written on it.

Morning Song

Dr. Subhash C. Biswas

(*This story is about a little child named Nimchand or Nimu, two and a half years old, who belongs to DeBiswas family. It is a large family with many members living in a huge complex in the village of Barrackpur.*)

It is breakfast time in the morning. Durgapooja festival is over. Father Somesh, uncles Khagesh and Prabhas are all gone to their usual daily work. Nimu is eating breakfast along with his brothers, sisters and immediate cousins from these two uncles. Nirendranath or Niru, youngest son of Prabhas, is very intimate to Nimu. He is only a year older than Nimu. They usually stick together; people call them 'a pair of gems'. Nimu being the youngest of all gets affectionate attention of others. He is, as usual, the centre-point of amusement in the breakfast hall. Nimu responds to everyone's funny queries and makes waves of uproarious laughter in the hall. He forgets to eat and gets delayed in finishing his food. All the children are gone after finishing their breakfast. Nimu is now all alone; even Niru, he is gone too. Sarojini helps Nimu with his food. After finishing, she tells him to go out and play in the kitchen verandah with *Thakuma* (grandmother Parulbala). Sarojini's movement has slowed down recently; she is carrying her tenth child and the pregnancy is at a matured stage. Nimu rushes out, but there is no one there in the verandah. He gets down the stairs, a step at a time and walks across the kitchen yard, and then climbs up the five steps of the staircase to get on the huge *royak*. The *royak* is a wide terrace running along the three sides of the house complex and enclosing the main courtyard of the size of a football ground. The fourth side of the yard is bordered by *Pujamandap* (building for Puja festivals).

Nimu gets down in the main courtyard, confidently with no hesitation, as if he does it every day. He has no idea that the festive days are over. He is expecting to find some playmates in the courtyard like in the previous days. But there is no one there today. This household has many residents; every day is like a festival day. The courtyard and the *royak* are always populated with some people. Today is an exception; the vast compound is a lonely, quiet place. Because of exhaustive festivities during the last few days, people are resting inside. Nimu doesn't get disheartened; he walks through the entire courtyard, on to the next yard and then to yet another big yard. Encouraged by his new-found freedom and driven by his zeal to explore places, Nimchand proceeds all alone with his little feet making small steps and trails along whatever path he discovers. He goes past all the quarters of the huge complex and exits into the outside land totally new to him. He suddenly encounters a squirrel staring at him with two cute little eyes, as if it wants to play with him. But as he advances, the furry little creature with its long, curly tail vanishes in a trice into a wood. Nimchand does not cease his quest; he continues with whatever drives him. The wood lying in front of him is irresistibly inviting.

It is the month of *Ashwin* when the weather in the village of Barrackpur is at its best. Floating clouds are casting shades every now and then, breaking the continuous sunlight. The magic spell of a beautiful, sunny day bewilders Nimchand. He doesn't feel scared; he marches on. He is enchanted by a charming cool breeze gently blowing in a vast, wonderful world of green. Trees, shrubs, and wild flowers of many colours attract him; but he is most fascinated by butterflies that are flying from flower to flower and by dragonflies that are trying hard to sit on the tendril of a twig. Nimchand is especially fond of these two flying beauties; he has seen their pictures in his book of rhymes. He runs after them, tries to catch them and giggles when they fly away deceiving him in a funny way. He has forgotten he was told to stay in the kitchen verandah. He has discovered a

whole new world of fun and joy. He desperately wants to catch a dragonfly and then fly with a bird, sit on a branch of a tall tree and chirp together.

Nimchand walks past small bushes following a dragonfly. He then circles around a Neem tree that comes in front of him. He stops for a moment and then heads in another direction. He walks through a patch of tall grass, a sloppy area covered with green moss, and then stops at a little garden of flowers. The dragonfly is now out of sight; but what he discovers is captivating more than ever. Nimchand stands on the edge of a big pond and his eyes get stuck on bright pink water hyacinths floating in water. He jumps with joy seeing ducks swimming in the pond. A long neck white swan is just as beautiful as he has seen in his book. It is swimming majestically in an easy comfortable style, with ducklings following it. He sees the little waves rippling around the ducklings on the surface of the water and watches them splash on the bank of the pond close to his tiny feet. Nimchand wants to join in the fun and be one of the ducklings. His joy knows no bound.

Grandmother Parulbala left the verandah to attend to some immediate need for a short while. On coming back, she enquires about Nimu. Sarojini, surprised not seeing Nimu around, asks, "Where's Nimu, Ma?" "I've the same question, where's he Saroj?" Parulbala is also taken by surprise. "I told him to stay in the verandah with you; haven't you seen him?" "No," says Parulbala with astonishment. "I left the verandah a while ago and just come back. May be he's with Nisha in your room. I'll give a shout." Nisha, sixteen-year old, is Sarojini's third daughter after Joya and Radha who are married. Nimchand is very fond of Nisha and goes to her whenever a chance occurs. So it is highly probable that Nimu has gone to her. Parulbala calls out for Nisha. The bedroom is at the far end of the complex on the second floor. Nisha responds, but no, Nimu is not with her, nor has she seen him after breakfast. Sarojini gets worried; she rises from the stool, rushes through the door and looks all around calling out repetitively "Nimu, where're you?" She hears no response. Her head starts turning, her face becomes pale with ludicrous bafflement and eyes roll fast eagerly

searching for Nimu. She is restless; her heart is pounding. Parulbala tries to console her saying, "Nimu can't go far; he must be somewhere nearby. Don't run around, sit down here. We'll look for him." But Sarojini doesn't listen. She goes to the main courtyard that is still an empty place, lonely and quiet. Sarojini is now scared and desperate. She calls out loud, "Nimu, Nimu, ---."

Sarojini's desperate cry breaks down the rare, unusual calm in DeBiswas Dham. People come out of their rooms to inquire about what has gone wrong with Nimu. Barhokali, an older cousin of Nimu, comes forward before anyone else. An energetic young man, Barhokali is, by nature, a helpful person. He is exceptionally helpful for Sarojini and Sarojini loves him like her own son. Apart from his good nature, there is an interesting side in his character. He is very fun loving, especially with children. He stands out in his age group for his good spirit and leadership quality that are held in high esteem in the DeBiswas household. He loves all the children in this home, but he loves Nimu the most. He has a special playful relationship with him. He teases Nimu by repetitively reciting funny rhymes that he makes up, inciting Nimu to the point of crying. When Nimu cries out loud, he rushes to him, carries him on his lap and consoles him by offering him a few *batasas*. Nimu is extremely fond of *batasa*.

Seeing Barhokali, Sarojini feels some consolation and regains some hope. "Barhokali, I can't find Nimu. He must have lost his way; do something to find him," Sarojini asks frantically. She is almost on the point of crying. "Calm down *Naw-kakima*, relax," Barhokali tries to lighten up the situation. "I'll find him out." He gives consolation and some assurance to Sarojini. "Barhokali, I always have faith in your prudence and wisdom," says Sarojini sobbingly in a mellow voice and leaves a sigh of relief. Looking at him with some feeling of hope, she utters, "God be with you, Barhokali."

A big crowd has gathered surrounding Sarojini in the main courtyard. Everyone has questions and suggestions; some even do not hesitate to make adverse comments out of their jealous mentality, ignoring the immediate problem. Nirmala,

wife of Prabhash and mother of three including Niru, is the first to make such a comment. She lost her first child, a daughter named Khuku, two years ago. She has not yet recovered totally from that grief; her temperament often gets adversely affected. Regarding Nimu, she seems to have a complex. Nimu is highly praised by most for his cute look and precocity; but Nirmala, despite her closeness to him, remains apathetic. She strongly desires her son Niru to be as good as Nimu or better in every respect. So she often picks faults with Nimu, even if there is none, and compares with Niru proving him better. Yet at times she cannot hide her love for Nimu, because he is so adorable that it is difficult not to love him.

"Nimu is always like that, he sneaks out whenever he gets a chance," says Nirmala sneeringly with a frowning look. "*Didi* (Sarojini) is not enough attentive; she has too many. But we must try hard to find Nimu."

"Probably because of her present condition, it is not possible to constantly watch Nimu," says Sohagi, the other sister-in-law and wife of Khagesh. "She should have asked one of her children to do it. Nisha can take care of Nimu; she's mature enough." Nisha, shamefaced, is standing nearby with head bent down out of feeling of guilt. After all, she does take care of Nimu without anyone asking. Now she is blaming herself. Her immediate sister, Monisha, is standing close to her, equally abashed.

"What have you been doing, Nisha? Can't you look after your little brother, you good for nothing?" Nirmala shoots irrationally at Nisha with her usual frown. "I was busy auntie, with my embroidery and knitting. Monisha was with me. I feel so sorry; but I really didn't know Nimu was all alone." Nisha is very sincere, responsible and dependable. It is true she was busy with knitting and embroidery. She is knitting a woolen set for Nimu and embroidering a design, all for submitting for a competition organized by the Union Board formed with five villages.

"I need no comments or arguments," says Sarojini, terribly distressed and writhing in agony. "I need help to find my son; please help me." Her face looks gloomy out of panic and desperation. Rupali, wife of Barhokali, comes forward and stands close to Sarojini. An intelligent young lady, she is calm and patient by nature and a favourite of Sarojini.

"Let's not make comments that are of less importance at this moment," Rupali pronounces loudly and emphatically to draw attention of everyone present. "Our immediate task is to find Nimu," she continues. "I believe children will know better where Nimu can be found." She collects all the children in one place. Addressing particularly Niru and Nimu's another cousin Gour, she asks, "Where do you think Nimu can be? What are his favourite places to hide?"

"His most favourite is the *Pujamandap*," says Niru. "But we have searched that big hall and all other places we can hide. We didn't find Nimu."

Barhokali opens his mouth. "*Pujamandap* is the most probable place, but it's eliminated now. The matter is more serious than I thought. Let's begin the search in an organized fashion without further delay; every minute is important. I'm dividing our compound in five sectors, four of which have an exit gate to outside; the fifth one contains the pond. So there'll be five groups led by five leaders – Nisha, my brother Keshto (Keshtokali), Gora (Gorachand), Gobindo and myself. Nisha, you lead the south-eastern sector, the smallest one. You may take your sister Monisha with you and four more. Gobindo takes charge of the north-eastern sector with the main gate, the Lion Gate as we call it. Keshto will cover the huge south-western sector containing many gardens and a wood with big trees, while Gora will lead his group to scan the areas around the pond. I'll cover the remaining sector, the big north-western sector, which as you know contain a dense wood and the northern bank of the pond."

The pond area is the most difficult area to search. No one knows this area better than Gora. He knows every tree, every shrub and every bush of this area.

He can tell how many big fish are there in the pond; he has even named them. Gobindo is the best all-rounder for the whole compound. Gorachand and Gobindo, two young men in their twenties, are two other cousins of Nimu.

"We will surely find Nimu," Barhokali goes on. "I know Nimu better than anyone else. He's smarter than other boys of his age. Moreover, he can't go out of our compound as it's protected, as you know, from all sides by a high wall and the gates are usually locked except for the Lion Gate. The Lion Gate remains clearly visible to all. While searching, remember he may ignore, as he often does, your frequent call out 'Nimu', 'Nimu' ---. The best way to get a response from Nimu is to tease him by singing rhymes that he dislikes. He instantly protests with a resounding 'NO' to such a rhyme, or may even break down into crying. You all know this, don't you? Sing any such rhyme you know, but here are two that he hates the most.

Nimchand, Nimchand,
Eats with the wrong hand,
Drinks by the nose;
Looking at a ladybug,
Calls it a rose.

And

Nimu, Nimu, Nimu,
Walks like an emu,
Hangs on the Neem tree,
Tim, Tim, Timu.

Another team will stay here in this courtyard with Rupali. As soon as Nimu is found, Rupali will organize to call off the search."

The teams disperse with their mission. Gora's team moves first and runs at full speed towards the pond. Nimu usually doesn't step in water; yet a child is always unpredictable. The other teams follow next. Duli (Shailabala) and her elder sister Phuli (Phuleshwari), also cousins of Nimu, want to go through the rooms and all corners of the building complex; so they leave too. Tristful Sarojini has sat down on the stairs that come down from the r*oyak* to the courtyard. She is broken down and tormented out of unbearable anguish. Rupali suggests the ladies should sit beside her so that she gets some comfort and consolation.

After about half an hour, Nisha comes back with her team with no trace of Nimu. A few minutes after, Gobindo also comes back with a negative nod. Keshto and Gora will take a long time to scan their huge areas. Barhokali remains optimistic; he knows how attracted Nimu is to his side of the compound. He is sure his high hopes will not go in vain. On exiting from the south-western yard of the complex and stepping into the gardens, they start singing out the rhymes in chorus. But there is no sound of protestation from any corner of the area; only the wind is rumbling through tall trees and birds are flying around. Close to the ground, there are butterflies and dragonflies and then there are ducks in the pond. Yes, ducks, Nimu has a great fascination for them. Barhokali advances towards a spot in the pond, where ducks and ducklings have gathered. Suddenly, he halts and calls for the attention of his team. "Do you hear some rustling in that bush on the slope of the pond, and some quacks?"

"Yes, yes," they respond enthusiastically and rush to the bush.

And there he is on the other side of the bush. Standing close to the water where the bush ends, Nimu is trying to catch a duckling with the help of a thin long stick. His attention is fully captured by these pretty creatures.

"Nimu, there you are!" Barhokali cries out as he descends down the slope. His voice cracks with emotion and joy. Seeing Barhokali, Nimu's face sparkles with a mouthful of grin. Startled and surprised, he utters his most coveted addressing,

"Barho-da!" and extends his arms toward him. Barhokali swiftly picks him up and holds him in a tight embrace saying, "You little thing, you'll never know how much suffering you've given to your mother!"

Barhokali turns back with his team. They are so happy finding Nimu that they start singing and dancing in jubilation. Barhokali makes up an instant rhyme for pleasing Nimu this time instead of teasing. All of them sing it in chorus while Nimu rests comfortably on Barhokali's shoulder.

People of the house come out and say,

Nimu is gone and lost his way.

Nimu is a brave boy everyone knows,

He is gone for a toy walking on his toes.

He found on the way a cute little duck,

And thought it to be a very good luck.

Butterflies, dragonflies, birds and bees,

Sing with Nimu dancing on the trees.

Sarojini's condition is miserable. She is repenting for her momentary neglect and feels remorse for her failure to keep a watchful eye on Nimu. "I'm getting scared, Rupa. He's a little boy and there're jackals, snakes, stray dogs; he may be in danger. Rupa, let's go, you and me. He'll surely respond to his mother's call." Sarojini is desperate. "No auntie, stay calm, don't panic. Your Barhokali will surely find him," consoles Rupali.

"But there's no good news yet, it's all my fate," Sarojini laments bending her head on her right palm. "You know Rupa, when Nimu was in my womb, an old lady read my palm and predicted I was going to give birth to a boy who would be intelligent, good-natured and handsome and who would always stand

by me at all times. And she also warned I must take good care of him. Now see I've failed, I've failed miserably." Sarojini bursts into tears and hits her forehead by hand repetitively. "Rupa, we must go to look for him. Come on, let's go." Sarojini tries to stand up. "Don't move a step from here, I tell you," says Parulbala. "Everything is going to be alright, have faith in God and pray."

"I hear something, do you?" Rupali says excitedly. She tries to listen more attentively. "They're singing a rhyme, a happy rhyme. I'm sure they've found Nimu."

Barhokali, with a wide grin and a proud face, shows up with Nimu on his shoulder. The team members are singing the rhyme and walking in rhythm behind him. Nimu is tightly holding Barhokali's head and apparently enjoying the rhyme while laughing and giggling. Nirmala rushes toward them holding Niru's hand.

"Give him to me, Barhokali," says a happy Nirmala with much eagerness. She takes him on her lap and cuddles him. The situation has enforced her to reveal hidden love she has been nourishing in her heart for Nimu. "Where have you been, Nimu?" she says in a voice choked with emotion. "Look at your Niru-da, he has been crying for you."

"Nimu, why did you go all alone?" Niru asks sobbingly. "Niru-da, I saw a squirrel; it looked at me and ran away."

Nirmala hastily takes Nimu to Sarojini. "Here's your over-smart much beloved son; take him to your bosom." Nimu jumps on to mother's lap. He doesn't know what has been going on; he doesn't understand what everyone has just gone through. Sarojini holds Nimu tightly in her bosom. Her face brightens up with blithe relief from the misery she was going through; her eyes get inundated with tears of joy. She smiles and cries at the same time; she is speechless. A blissful moment radiates heavenly joy touching every heart. Nisha, standing nearby, comes close to mother and holds a hand of Nimu, lovingly. Parulbala comes forward and pronounces with the command of grand-motherliness, "Nisha, from

now on you take charge of Nimu. Always stay with him, help him for everything and never leave him out of your sight."

"Yes, *Thakuma*, I'll do that," Nisha says reassuringly. "I can also take care of Nimu; I'll help *didi*." Monisha gladly offers her help. "Good Monisha, you'll help Nisha." Nisha takes Nimu from mother's lap. "Come Nimu, come with me." Nisha promises to herself to take good care of Nimu, despite her pressing engagement with embroidery and knitting work.

The Sun has gone down behind the *Pujamandap* building. The children who were playing in the main courtyard are all gone. Somesh and Prabhas are back home and gets the news of Nimu's adventure. Sarojini, Nisha, Monisha and a few others have surrounded them. Nimu releases himself from the grip of Nisha and runs to father and talks of his getting lost, as if it was a great achievement. Prabhas takes him on the lap and asks about what happened.

"*Monikaka*, I saw little ducks, many, swimming," Nimu says with excitement. "And you wanted to be one like them, right?"

"Ya."

"But *Kaku*, never go alone, ok?"

"Ok, *Monikaka*."

Uncle Prabhas, always jovial and playful, is a favourite of all children, especially of Nimu. He tells him stories and gives him unending love. Somesh casts a sympathetic look at Sarojini. He is a man of a few words, serious and remains engaged with his busy day to day schedule and less involved with petty family matters. He appears indifferent and self-composed. He has a dignified personality that earns him a lot of respect. People hesitate respectfully to approach him. All children love him dearly; yet observe a certain reverential distance. He doesn't say a word to Sarojini, but feels deeply at heart what miserable time poor Saroj had to go through. "It's getting dark; get inside everyone," Somesh utters gravely.

Nimu is growing up and learning new things faster than other children of his age. Nisha's love and care provide valuable guidance for him. Nimu's zeal for learning gets stronger day by day. Nisha reads books to him every day and he knows them all by heart and can recite gladly any number of times. Nimu gets up early in the morning before sunrise; so does Nisha. It has become a set routine for both of them.

Every morning after waking up, Nimu runs to the roadside window, sits on the sill and waits for something he loves most. Every day at the daybreak, a man walks down the village road that Nimu can see from the window. He sings a beautiful *Keertan* with melodious sound of *kartaal* (cymbals played by hand). Nimu listens with full attention and also sings and dances with the rhythm; he does not move from the window until the singer goes out of sight. Nisha stands by and enjoys the masterpiece theatrical show. On one such morning, this routine gets broken by a fine interruption. It is not yet the wake-up time of Nimu; but Nisha tries to wake him up. "Wake up Nimu, wake up, ---." Nimu wakes up. "What Sej-di?"

"Do you hear something?"

"Yes, baby crying."

"We've a new baby brother! Hurrah! ---." Nisha picks up Nimu, holds him tight and dances. The eastern sky has an unusual glow today; the Sun is about to rise. The Keertan-man sings out his morning song outside.

Prabhata samaye Sachir anginer majhe

Gourchand nachiya baray re

Jagonigo Sachimata, Gour aylo premdata,

Ghare ghare harinaam bilay re.

(*In the morning time in Sachi's compound,*

Gourchand dances around.

Wake up mother Sachi, wake up wake up,

Here comes Gour with his love

To sing the name of Hari to every home.)

Baby's cry mingles with the sweet melody of the morning song lingering from a distance. The glowing Sun rising in the east opens the door to a colourful new world.

Bidita Mukherjee (Age 11)

Shonali Sen (Age 6)

Snow Geese Migration

Yogadhish Das

Every Fall and Spring, snow geese migrate over areas east of Ottawa. A few years ago, I had the good fortune to experience the overwhelming sight of migrating snow geese in tens of thousands around the city of Cornwall. The adrenaline rush from seeing so many birds take off with the roar of a jet engine and cover the sky was simply surreal. It is impossible, at least for a photographer of my limited skills, to capture the grandeur of such a magnificent spectacle. But here are six of my photos, anyway..

OM Mukherjee (Age 6)